শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।

সূচিপত্র

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা

মাতা-পিতার খেদমত

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ

ঘুমানোর আদব

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার সহজ পদ্ধতি

যবানের হেফাযত

হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বায়তুল্লাহর নির্মাণ

সময়ের মূল্য দাও

ইসলাম ও মানবাধিকার

শবে বরাতের হকীকত

আজ আমাদের অবস্থা হলো, সকল বিষয়ের ফিকির আছে; কিন্তু দ্বীনের কোনো ফিকির নেই। দ্বীন যদি এতই পরিত্যক্ত বস্তু হয়, তাহলে নামায পড়া, তাহাজ্জুদ পড়া কিংবা মসজিদে যাওয়ার কষ্ট করার দরকার কী (!) নিজেও সন্তানের মতো হয়ে যান না কেন? শিশুকালে সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় নার্সারিতে। সেখানে তাকে কুকুর-বিড়াল শেখানো হয়; কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। তারাই তো জাতির ভবিষ্যত। জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব তো তাদের হাতে। অথচ তারা নিজেরাই হারিয়ে যাচ্ছে গোমরাহীর আবর্তে॥ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ : ٦)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হামদ ও সালাতের পর

আল্লামা নববী (রহ.) এ বিষয়ে 'রিয়াদুস সালেহীন'-এ একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যার মর্ম হচ্ছে, শুধু নিজেকে সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়; বরং স্ত্রী-সন্তান ও অধীন ও পরিজনকে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করা, তাদেরকে ফরয-ওয়াজিব পালন এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখাও তাঁর একান্ত কর্তব্য।

অপূর্ব সম্ভাষণ

তেলাওয়াতকৃত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনকালে বলেছেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'হে ঈমানদারগণ!'

কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেছেন। এ

প্রসঙ্গে ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : আল্লাহর সম্বোধন মুসলমানদের জন্য يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا এর মাধ্যমে স্নেহ ও ভালোবাসা ঝরে পড়েছে। কারণ, সম্বোধনের দুটি নিয়ম আছে। এক. সম্বোধিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকা। দুই. আত্মীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সম্বোধন করা। যেমন– পিতা পুত্রকে ডাকার সময় নাম ধরে ডাকে অথবা শুধু 'বেটা' বলে ডাকে। বেটা বলে ডাকার মধ্যে যে স্নেহ ও ভালোবাসা রয়েছে এবং তা শ্রবণে যে মাধুর্য রয়েছে, নাম ধরে ডাকার মধ্যে সেই স্নেহের ছোঁয়া এবং ভালোবাসার স্পর্শ নেই।

'বেটা' শব্দ স্নেহের শব্দ

শায়খুল ইসলাম হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) গভীর জ্ঞান ও গবেষণার অধিকারী ছিলেন। শুধু পাকিস্তানেই নয়; বরং গোটা বিশ্বে তাঁর মতো আলিম ও গবেষক সমকালে সম্ভবত ছিলো না। তাই কেউ তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' বলে সম্বোধন করতেন, কেউ 'আল্লামা' বলে ডাকতেন। আমার দাদী যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। কারণ, পৃথিবীর বুকে তাঁকে 'বেটা' বলে ডাকার মতো আমার দাদী ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলো না। এ শব্দটি শোনার জন্যই তিনি দাদীর নিকট ছুটে আসতেন। বেটা শব্দ শোনার মধ্যে যে পুলক রয়েছে, তার সামান্যতম ঝলকও অন্য কোনো শব্দের মাঝে নেই।

আসলে মানুষের এমন মুহূর্তও আসে, যখন 'বেটা' শব্দ শোনার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা ঈমানদারকে স্নেহপূর্ণ শব্দে সম্বোধন করেছেন। তিনি সম্পর্কের সূত্র ধরে ডাক দিয়েছেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 'হে ঈমানদারগণ!' এটা ঠিক পিতার সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয় ও কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তা-ই পালন করে।" [সূরা তাহরীম : ৬]

আমল নিজের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : কেবল নিজেকে আগুন থেকে বাঁচালাম আর নিশ্চিন্তে বসে থাকলাম– এতটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং পরিবার-

পরিজনকেও আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। বর্তমানে আমরা দেখি, মানুষ নিজে খুব ধার্মিক, নামাযের গুরুত্ব দেয়, যাকাত আদায় করে, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ খরচ করে এবং শরীয়তের সমূহ বিধি-বিধানের উপর আমল করার চেষ্টা করে; অথচ তার স্ত্রী-সন্তানের প্রতি তাকালে মনে হয় পূর্ব-পশ্চিম পরিমাণ ব্যবধান। সে এক পথে, তারা অন্য পথে। স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফরয-ওয়াজিবের তোয়াক্কা নেই, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ফিকির নেই। তারা গুনাহর জোয়ারে ভাসছে। অথচ সেই ধার্মিক (?) আত্মতৃপ্তিসহ বসে আছে। মনে করে, আমি তো মসজিদের প্রথম কাতারে শামিল হই, জামাতে নামায আদায় করি। অথচ পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর ব্যাকুলতা নেই। সুতরাং এমন ব্যক্তিরও মুক্তি নেই। এ ব্যক্তি আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না। শুধু নিজের কৈফিয়ত দিয়ে পার পাবে না, বরং স্ত্রী-সন্তানেরও কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ, তাদেরকে রক্ষা করারও দায়িত্ব ছিলো তার। সুতরাং কিয়ামতের দিন সেও পাকড়াও হবে এবং জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে।

সন্তান যদি না মানে?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন : তোমরা নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। আসলে এখানে একটি সন্দেহের অবসানের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যে সন্দেহটি সাধারণত আমাদের অন্তরে জাগে। সন্দেহটি হলো, আজকাল যখন কাউকে বলা হয়, নিজের ছেলে-মেয়েকে দ্বীন শেখাও এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা কর, তখন এর উত্তরে বলা হয়, ছেলে-মেয়েকে দ্বীনের পথে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু কী করবো? সমাজের পরিবেশ খারাপ, অনেক বোঝানোর পরও তারা মানতে চায় না। পরিবেশের কারণে তারা বিপথে চলে গেছে। তাই কী আর করা.... তাদের আমল তাদের কাছে, আমার আমল আমার কাছে। আরো প্রমাণ হিসেবে পেশ করে, হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলেও তো কাফির ছিলো। নূহ (আ.)ও তো তাকে প্লাবন থেকে বাঁচাতে পারেননি। অনুরূপভাবে আমরা চেষ্টা করতে ক্রটি করিনি। না মানলে তো কিছু করার নেই।

দুনিয়ার আগুন থেকে কীভাবে বাঁচান?

কুরআন মাজীদের এ আয়াতটিতে 'আগুন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটিতেই সন্দেহের নিরসন রয়েছে। তা এভাবে যে, পিতা-মাতা যদি সন্তানকে ধর্মহীনতা থেকে বাঁচানোর পূর্ণ চেষ্টা করে, তাহলে তারা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। সন্তানের দায় তখন সন্তানের উপরই বর্তাবে। কিন্তু দেখতে হবে, পিতা-মাতা কী পরিমাণ চেষ্টা করছে। কুরআন মাজীদে 'আগুন' শব্দটি ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতা নিজের ছেলে-মেয়েকে গুনাহ থেকে

এমনভাবে রক্ষা করবে, যেমনিভাবে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যেমন– একটি লেলিহান অগ্নিকুণ্ড, যার সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত যে, এ অগ্নিকুণ্ডে যে প্রবেশ করবে, সে নির্ঘাত মারা যাবে। সুতরাং যদি কোনো অবুঝ শিশু সুন্দর মনে করে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে চায়, তখন তার পিতা-মাতা কী করবে? পিতা-মাতা কি সন্তানকে শুধু এই উপদেশ দিয়েই নিশ্চিন্ত বসে থাকবে যে, বাবা! ওখানে যেও না। যদি যাও, তাহলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে, তুমি নির্ঘাত মারা যাবে। এ উপদেশ সত্ত্বেও যদি সন্তান অগ্নিকুণ্ডের প্রতি অগ্রসর হয়, তখন পিতা-মাতা কী ভূমিকা পালন করবে? তারা কি মনে করবে, যে উপদেশ দিয়েছি এতেই তো যথেষ্ট হয়েছে! আমাদের দায়িত্ব আমরা শেষ করেছি। এবার মানা না মানা তার ব্যাপার। পিতা-মাতা এভাবে দায়মুক্তির চিন্তা করবে, নাকি সন্তানকে বাঁচানোর জন্য বিচলিত হয়ে পড়বে? অবশ্যই বিচলিত হবে। বরং সন্তানকে অগ্নিকুণ্ডের পাড় থেকে নিয়ে না আসা পর্যন্ত দুনিয়া তাদের কাছে অন্ধকার মনে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন : হে আমার মুমিন বান্দা! তুমি নিজের সন্তানকে দুনিয়ার সামান্য আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য এত ব্যাকুল, এর জন্য শুধু মুখের উপদেশের উপর আস্থা রাখতে পার না। সেখানে জাহান্নামের সেই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড, যার ভয়াবহতা কল্পনাকেও হার মানায়, সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে নিজের পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য শুধু মুখের উপদেশকে যথেষ্ট মনে কর কীভাবে? সুতরাং পিতা-মাতা সহজেই বলতে পারবে না দায়মুক্তির কথা। তাদেরকে বুঝিয়েছি, নিজের দায়িত্ব আদায় করেছি, এসব বলে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

সব কিছুর ফিকির আছে, শুধু দ্বীনের ফিকির নেই

হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে সম্পর্কে বলা হয়, সে কাফির ছিলো; তাকেও কুফরী থেকে ফেরানো সম্ভব হয়নি। এর দায়ভার হযরত নূহ (আ.)-এর উপর বর্তায় না। কারণ, তিনি ছেলের পেছনে লাগাতার নয়শত বছর মেহনত করেছেন, তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাই তিনি জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, আমরা দু'-একবার বলি। তারপর হাত-পা ছেড়ে দিই। অথচ উচিত ছিলো, সব সময় বিচলিত থাকা, যেমনিভাবে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকি। অন্তরের ব্যথা যদি এ পর্যায়ের না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, দায়িত্ব পুরোপুরি পালন হয়নি। আজকাল দেখা যায়, ছেলের প্রতিটি বিষয়ে মাতা-পিতা নজর রাখে। লেখাপড়া, থাকা-খাওয়াসহ সকল কিছু ঠিকমতো চলছে কিনা, এ নিয়ে পিতা-মাতার কত মাথা ব্যথা। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই।

কিছুটা বদদ্বীন হয়ে গেছে

এক তাহাজ্জুদগোজার ব্যক্তি। তার ছেলে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছে। ইংরেজি শিখেছে। তারপর ভালো একটি চাকরিও পেয়েছে। একদিন তার বাবা খুশির সঙ্গে বললেন : 'মা-শা-আল্লাহ' আমার ছেলে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছে, ভালো চাকুরিও পেয়েছে। এখন সমাজে সে মাথা উঁচু করে অবস্থান করছে। কিন্তু কিছুটা বদদ্বীন হয়ে গেছে (!) বাবার কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, একটু বদদ্বীন হওয়া তেমন কিছু নয়। এটা সাধারণ বিষয়। অথচ ভদ্রলোক বড় দ্বীনদার! নিয়মিত তাহাজ্জুদও পড়েন!!

শুধু রূহটা নেই

আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) একটা ঘটনা বলতেন। একলোক মারা গেছে। লোকেরা জীবিত মনে করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে, ডাক্তার যেন পরীক্ষা করে দেখেন, এ ব্যক্তির কী হয়েছে? সে নড়াচড়া করে না কেন? ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন : লোকটি সম্পূর্ণই ঠিক আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গই ঠিক আছে, তবে শুধু রূহটা নেই। রূহটা বের হয়ে গেছে। তেমনিভাবে ভদ্রলোক নিজের ছেলে সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, মাশাআল্লাহ সে এখন অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু শুধু একটু বদদ্বীন হয়ে গেছে। যেন বদদ্বীন হওয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এর দ্বারা বড় কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো বিষয়ও নয়।

নতুন প্রজন্মের অবস্থা

আজ আমাদের অবস্থা হলো, সকল বিষয়ের ফিকির আছে; কিন্তু দ্বীনের কোনো ফিকির নেই। দ্বীন যদি এতই পরিত্যক্ত বস্তু হয়, তাহলে নামায পড়া, তাহাজ্জুদ পড়া কিংবা মসজিদে যাওয়ার কষ্ট করার দরকার কী (!) নিজেও সন্তানের মতো হয়ে যান না কেন? শিশুকালে সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় নার্সারীতে। সেখানে তাকে কুকুর-বিড়াল শেখানো হয়; কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। তারাই তো জাতির ভবিষ্যত। জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব তো তাদের হাতে। অথচ তারা নিজেরাই হারিয়ে যাচ্ছে গোমরাহীর আবর্তে— কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে।

বর্তমানের ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার মাথায় সওয়ার

আল্লাহ তাআলার একটা নীতি আছে, যার বর্ণনা হাদীস শরীফে প্রদান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মাখলুকের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাআলা ওই মাখলুককে তার উপর চড়াও করে দেন। যেমন– আজকাল তা-ই

হচ্ছে। পিতা-মাতা সন্তানকে খুশি করে। তার আয়-রুজি ও সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করে। এসব কিছু করতে গিয়ে আল্লাহকে নারাজ করে। অবশেষে ফল মিলে, ওই সন্তানই পিতা-মাতার মাথার উপরে উঠে বসে। পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে ওই সন্তানই তাদের নার্সিংহোমে রেখে আসে। ওখানে পিতা-মাতার জীবন কেমন কাটে, তার খোঁজ-খবরও সন্তান নেয় না।

পিতা-মাতা নার্সিংহোমে

এমন অনেক ঘটনা পশ্চিমাদের দেশে আছে যে, বৃদ্ধ পিতা নার্সিংহোমে পড়ে থাকে। এমনই এক পিতা নার্সিংহোমে মারা গেছে। ম্যানেজার ছেলের কাছে ফোন করেছে, আপনার পিতা মারা গেছে, তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন। ছেলে উত্তর দিলো, পিতার মৃত্যুতে আমি আন্তরিকভাবে শোকাহত। কিন্তু দয়া করে আপনি তার কাফন-দাফনের কাজটা সেরে ফেলুন। আমি এসে বিল পরিশোধ করে দেবো।

করাচির নার্সিংহোমেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। ছেলেকে মৃত্যুসংবাদ জানানো হলে সে প্রথমে আসার ওয়াদা দিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা না করে বললো : জরুরি মিটিং আছে, বিধায় আসতে পারবো না।

গভীরভাবে ভাবুন, এই সেই সন্তান, যাকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা হয়েছে।

সন্তানের প্রতি ইয়াকুব (আ.)-এর উপদেশ

মৃত্যুর সময় সাধারণত মানুষ ছেলে-মেয়েদের একত্র করে। উদ্দেশ্য, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদের কী হবে? তোমরা কীভাবে আয়-রোজগার করবে? হযরত ইয়াকুব (আ.)ও মৃত্যুর সময়ে তাঁর সন্তানদের একত্রিত করলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছে আয়-রোজগারের কথা জিজ্ঞেস করেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'বল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে?' বোঝা গেলো, সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য এ ধরনের চিন্তা-ই করতে হবে।

শিশুদের সঙ্গেও মিথ্যা না বলা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক মহিলা নিজের শিশুকে কোলে নেয়ার জন্য ডাকছিলো। শিশুটি আসতে চাচ্ছিলো না। মহিলা শিশুটিকে বললেন : আস, তোমাকে একটা জিনিস দেবো।

একথা শুনে শিশুটি কোলে এসে পড়লো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি যে বলেছিলে তাকে কিছু দেবে, সত্যিই কি তাকে কিছু দেয়ার ইচ্ছা তোমার আছে? মহিলা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটা খেজুর আছে। ওই খেজুরটি তাকে দেয়ার ইচ্ছা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি তোমার এই ইচ্ছা না থাকতো, তাহলে তোমার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয়ে যেতো। কারণ, তখন তোমার অঙ্গীকারটি মিথ্যা হতো। তখন তার কচিমনে তুমি একথা বসিয়ে দিতে যে, মিথ্যা ও ওয়াদা ভঙ্গ তেমন কোনো খারাপ কাজ নয়।

কচি বয়স থেকেই সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া

এ হাদীসটি একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কচি বয়স থেকেই শিক্ষা শুরু হয়। বিন্দু বিন্দু বিষয় থেকেই সে চরিত্র শেখে। বর্তমানে দেখা যায়, পিতা-মাতা নিজেদের ছেলে-মেয়ের ভুল-ত্রুটি ধরে না। মনে করে, অবুঝ শিশু, তাকে মুক্তমনে বড় হতে দেয়া উচিত। সকল ব্যাপারে ধরাধরি করা অনুচিত।

প্রকৃতপক্ষে শিশু অবুঝ হতে পারে, কিন্তু মাতা-পিতা তো অবুঝ নয়। তাদের উচিত সন্তানের ছোটখাটো বিষয়েও লক্ষ্য রাখা। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা.] থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নিজের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও।' যদিও তখনও নামায ফরয হয়নি। কিন্তু অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এ বয়স থেকেই নামাযের আদেশ দিতে হবে। 'দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাকে মারধর কর এবং ঘুমের বিছানাও আলাদা করে দাও।'

এ হাদীসের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন : শিশুকে সাত বছরের পূর্বে নামায, রোযা ইত্যাদির জন্য চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। তাই বলা হয়, সাত বছরের পূর্বে কোনো শিশুকে মসজিদে আনা উচিত হবে না। তবে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না করার শর্তে কেবল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আনা যাবে।

শিশুকে খাবারের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া

عَنْ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِى حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِىْ بَعْدُ

হযরত আমর ইবনে সালামা (রা.) বলেছেন, ছোট বেলায় আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খানা খাওয়ার সময় প্লেটের এদিক-ওদিক হতে খাচ্ছিলাম। এটা দেখে রাসূল (সা.) বললেন : প্রিয় বৎস! বিসমিল্লাহ পড় এবং ডান হাত দ্বারা খাও, আর তোমার সামনের দিক থেকে খাও।

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে এ রকম ছোট ছোট বিষয়েও সতর্ক করেছেন। তাদেরকে আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।

শিশুকে মারধর করার মাত্রা ও নিয়ম

শিক্ষক ও পিতা-মাতা শিশুদেরকে প্রহার করতে পারবেন, যে পরিমাণ প্রহারে কোনো চিহ্ন না পড়ে। দাগ না পড়লে এতটুকু প্রহার জায়েয। আজকাল শিশুদেরকে এমনভাবে মারা হয়, যার ফলে রক্ত ঝরে, শরীরে দাগ পড়ে। এমনকি শিশু আহতও হয়ে পড়ে। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন : আমার বুঝে আসে না, এ গুনাহের ক্ষমা কীভাবে হবে? কারণ, ক্ষমা কার নিকট চাইবে? শিশুর নিকট ক্ষমা চাইলে সে তো ক্ষমা করার যোগ্য নয়। তার ক্ষমা গ্রহণযোগ্যও নয়।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন : কোনো শিশুকে মারার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে গোস্বার সময় সাথে সাথে মারা উচিত নয়। বরং রাগ দূর হওয়ার পর কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে প্রহার করা উচিত, যাতে সীমা লংঘিত না হয়।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এ পার্থিব জগতে রয়েছে হাজারো ভালোবাসা। রয়েছে বহু ধরনের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক ও ভালোবাসার মাঝে লুকিয়ে থাকে কোনো না কোনো স্বার্থ, কোনো না কোনো আশা। ভালোবাসার বিচিত্র এ ভুবনে নির্ভেজাল শুধু একটাই। তাহলো সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার মায়া-মমতা। এ মহব্বত তাঁদের স্বভাবজাত। এর মাঝে থাকে না কোনো স্বার্থ, থাকে না কোনো উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্য কোনো মহব্বত বেগরজ নেই, নিঃস্বার্থ নেই। যেমন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে অনেক আশা ও ভরসা। ভাইয়ের সঙ্গে মহব্বত। তাতেও থাকে আদান ও প্রদান। মোটকথা দুনিয়ার সকল সম্পর্ক উদ্দেশ্যমুক্ত দাবি করা যাবে না। কেবল একটি মহব্বত, একটি স্নেহ ও মায়া সকল স্বার্থ থেকে মুক্ত। তাহলো মাতা-পিতার মায়া ও করুণা। মাতা-পিতার মহব্বত একেবারে নির্ভেজাল, সম্পূর্ণ নিখাঁদ। এমন সন্তানের জন্য তাঁদের আবেগ ও জযবা এতবেশি উতলা থাকে, প্রয়োজনে নিজেকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের হকসমূহের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়েও মাতা-পিতার হককে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাতা-পিতার খেদমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (سورة النساء)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হাম্দ ও সালাতের পর!

"আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।"

[সূরা নিসা : ৩৬]

বান্দার হকের আলোচনা

আল্লামা নববী (রহ.) এখানে একটি নতুন পরিচ্ছেদের সূচনা করেছেন। মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রসঙ্গে এ পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছেন। যেমন আমি আগেও বলেছি, চলতি পরিচ্ছেদগুলোর বিষয়বস্তু হলো 'বান্দার হক'। কিছু আলোচনা পূর্বে করা

হয়েছে। এ নতুন পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়-স্বজনের হক। এ সুবাদে তিনি কুরআনের আয়াতের পর সর্বপ্রথম যে হাদীসটি এনেছেন, তাহলো—

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ - قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন : যথাসময়ে নামায আদায় করা। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম : নামাযের পর কোন আমলটি তাঁর কাছে সবচে প্রিয়? উত্তর দিলেন : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম : তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে নবীজি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' [বুখারী শরীফ]

হাদীসটিতে দ্বীনের কাজ বিন্যাস করা হয়েছে যথাক্রমে (এক) নামায আদায় করা। (দুই) মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। (তিন) আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।

নেক কাজের প্রতি স্পৃহা

এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে দু'টি বিষয় জানতে হবে। এক. হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ জাতীয় প্রশ্ন করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের জানার স্পৃহা ও আমলের জযবা ফুটে ওঠে। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে আমলটি বেশি প্রিয়, সেই আমলটি করার জন্য তারা উদগ্রীব থাকতেন, চেষ্টা করতেন। তাই তাদের হৃদয়ে সব সময় আখেরাতের ভাবনা থাকতো। তাদের একান্ত কামনা ছিলো একটাই— আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজি-খুশি করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা সর্বোত্তম আমল খুঁজে বেড়াতেন। আজকাল আমরা ফাযায়েলে হাদীসে বিভিন্ন আমলের তাৎপর্য শুনি ও পড়াশুনা করি। তবুও আমল করার প্রতি জযবা সৃষ্টি হয় না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুদ্র একটি আমলের খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে আমল করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতেন।

হায়, আমি অনেক কিরাত খুইয়ে ফেলেছি!

একবারের ঘটনা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সম্মুখে একটি হাদীস পড়লেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের জানাযায় শরীক হবে, সে এক কিরাত সওয়াবের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি জানাযার নামাযের পর জানাযার পেছনে পেছনে যাবে, সে দুই কিরাত সওয়াব লাভ করবে। আর যে দাফনেও অংশগ্রহণ করবে, সে তিন কিরাত সওয়াব পাবে।' অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও পরিমাণে বেশি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মুখে হাদীসটি যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) শুনলেন, তিনি আফসোস করে উঠলেন : 'হায়, আমি ইতোপূর্বে হাদীসটি শুনিনি! আমার অনেক কিরাত সওয়াব ছুটে গেছে।' অর্থাৎ আমার জানা ছিলো না, জানাযার নামাযে শরীক হলে, জানাযার পেছনে পেছনে গেলে এবং দাফনে অংশগ্রহণ করলে এত বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। আমার জানা না থাকার কারণে বহু কিরাত সওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে গেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ছিলেন একজন সাহাবী, যার জীবনের একমাত্র কর্মসূচি ছিলো সুন্নাতের উপর আমল করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মোতাবেক চলা। যার আমলনামায় নেকের পাহাড় খাড়া, তবুও তিনি একটি নতুন আমলের খোঁজ পেয়ে আফসোসে ফেটে পড়েন। হায়, আমি কেন এ পর্যন্ত আমলটি করিনি... কেন এর যথাযথ গুরুত্ব দিইনি!

এমনই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবা। যাঁদের কাজই ছিলো নবীজির সুন্নাতের উপর আমল করা। যাঁদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরে বেড়াতো নেক আমলের সন্ধানে। নেকের প্রবৃদ্ধি এবং আল্লাহ তাআলার রাজি-খুশি ছিলো যাঁদের সার্বক্ষণিক ফিকির।

প্রশ্ন একটি উত্তর কয়েকটি

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচে উত্তম আমল কোনটি? হাদীস শাস্ত্র মন্থন করলে পাওয়া যাবে, প্রশ্নটির উত্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। একেক সাহাবাকে একেকভাবে দিয়েছেন। যেমন এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সবচে উত্তম আমল হলো, সময়মতো নামায আদায় করা। এর আগে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন : সবচে উত্তম আমল হলো, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা। অর্থাৎ– চলাফেরা, উঠা-বসায় সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা তোমার যবানকে সিক্ত রাখবে। এটা আল্লাহর নিকট সবচে প্রিয় আমল।

অপর এক হাদীসে এসেছে, সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল (সা.) বললেন : সর্বোত্তম আমল পিতা-মাতার খেদমত করা। আরেক সাহাবী প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন : আল্লাহর পথে জিহাদ হলো সবচে উত্তম আমল।

মোটকথা প্রশ্ন ছিলো একটি; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক সাহাবীকে একেকটি উত্তর দিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে উত্তরগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। আসলে কিন্তু সাংঘর্ষিক নয়। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেয়ার সময়ে লক্ষ্য রেখেছেন প্রশ্নকারী সাহাবীর মন ও মানসের প্রতি।

সকলের বেলায় উত্তম আমল এক নয়

প্রকৃত কথা হলো, অবস্থার প্রেক্ষাপটে উত্তম আমল বিভিন্ন হয়। আমলের স্তর বিন্যাস প্রেক্ষাপটের আলোকে হয়। কারো জন্য সময়মতো নামায পড়া সর্বোত্তম আমল। কারো ক্ষেত্রে মাতা-পিতার সেবা সর্বোত্তম আমল। কারো বেলায় জিহাদ সর্বোত্তম আমল। কারোর ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির সর্বোত্তম আমল। সর্বোত্তম আমলের এ বিভিন্ন অবস্থার আলোকে ও মানুষ অনুপাতে হয়। যেমন হয়ত প্রশ্নকারী সাহাবা নামাযের খুব পাবন্দি করতেন। কিন্তু মাতা- পিতার খেদমতে উদাসীনতা দেখাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেলায় বললেন : সর্বোত্তম আমল মাতা-পিতার খেদমত করা। কারণ, নামাযের পাবন্দি তার তো আছেই। বিধায় তাঁর ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত উত্তর ছিলো এটাই।

কোনো সাহাবী হয়ত ইবাদতের খুব গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু জিহাদকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূক্ষ্মদর্শিতায় ধরা পড়েছে। তাই তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন : সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।

আবার দেখা গেলো, এক সাহাবী জিহাদ ও ইবাদতে কাজ করে খুব উদ্দীপনার সাথে। কিন্তু আল্লাহর যিকির করে নিতান্ত অনাগ্রহের সাথে। সুতরাং

তাঁর ক্ষেত্রে সঠিক ও যথার্থ উত্তর হবে এটাই যে, সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহ তাআলার যিকির।

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেকমতপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। অবস্থার আলোকে এবং প্রশ্নকারীর মন-মানস বিবেচনা করে বিজ্ঞোচিত জবাব দিয়েছেন। অবশ্য বিষয়টি সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, সময়মতো নামায পড়া, মাতা-পিতার সেবা করা, জিহাদ করা, সবসময় আল্লাহর যিকির করা উত্তম আমল। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলে বিবেচনাও ভিন্ন হবে।

নামাযের ফযীলত

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম আমল-সমূহের ক্রমবিন্যাস করেছেন। বলেছেন : সর্বোত্তম আমল সময়মতো নামায পড়া। শুধু নামায পড়া নয়, বরং সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়া। অনেক সময় মানুষ নামাযের সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। ওয়াক্ত পার হয়ে যায়, নামাযী মনে করে, এতে কী হয়েছে! কাযা হচ্ছে তো হতে দাও। এটা কোনো নামাযীর জন্য একেবারেই উচিত নয়। নামায সর্বদা সময়মতো আদায় করার অভ্যাস করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

ওই সকল নামাযীদের জন্য আফসোস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে থাকে বেহুশ! ওয়াক্ত চলে যায়, অথচ নামায আদায়ের খেয়ালই থাকে না। অবশেষে নামায কাযা হলে পরে হুঁশ আসে।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ

যার আসর নামায ছুটে গেলো, তার যেন অর্থ-বৈভব এবং পরিজন-পরিবার লুট হয়ে গেলো। সে যেন একেবারে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত হয়ে গেলো। সুতরাং নামায কাযা করা খুবই জঘন্য কাজ। এর জন্য কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। তাই নামাযের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যথাসময়ে নামায আদায়ের পুরোপুরি চেষ্টা করা আবশ্যক।

জিহাদের ফযীলত

আলোচ্য হাদীসের ক্রমধারামতে দ্বিতীয় স্তরের উত্তম কাজ হলো মাতা-পিতার খেদমত করা। তৃতীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদ

করা। মাতা-পিতার সেবার সুচিবিন্যাস জিহাদের মতো মহান আমলেরও উপরে। অথচ জিহাদ তো এত বড় আমল যে, হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যায়, আল্লাহ তাঁকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মতো পবিত্র মনে করে তোলেন। অপর হাদীসে এসেছে, মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে, আল্লাহর দীদার লাভে দীপ্ত হবে, আল্লাহ জান্নাতের দর্শন পাবে, তখন তার অন্তরে দুনিয়ায় পুনরায় আসার কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগবে না। কারণ, তখন তার সামনে দুনিয়ার তাৎপর্য উন্মোচিত হয়ে যাবে, জান্নাতের তুলনায় দুনিয়ার তুচ্ছতা প্রতিভাত হবে। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার সুখ-শান্তি স্বল্পমেয়াদী; জান্নাত চিরস্থায়ী, জান্নাতের সুখ-শান্তি দীর্ঘমেয়াদী– এসব বিষয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই সে দুনিয়াতে ফিরে আসার কামনা করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদ করেছে এবং শহীদ হয়েছে, সে তামান্না জানাবে, আহা, দুনিয়াতে যদি আবার যাওয়া যেতো! তাহলে ফের আল্লাহর রাহে জিহাদ করতাম, পুনরায় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতাম।

এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হৃদয়ের তামান্না হলো, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করে জীবন বিলিয়ে দিই। তারপর পুনরায় জীবিত হয়ে শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত হই এবং শহীদ হয়ে যাই। মোটকথা জান্নাতের ঠিকানায় পৌঁছে কোনো মানুষ দুনিয়ায় ফিরে আসার কামনা করবে না। কিন্তু শুধুই শহীদগণ ফিরে আসার বাসনা করবে। এ হলো জিহাদের মর্যাদা।

মাতা-পিতার হক

পক্ষান্তরে মাতা-পিতার হকের গুরুত্ব জিহাদের চেয়ে বেশি দেয়া হয়েছে। তাই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন : বান্দার সমূহ হকের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ হক মাতা-পিতার হক। কারণ, মাতা-পিতা একজন মানুষের অস্তিত্বের ওসীলা। তাই তাদের হক সবচে বেশি। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের প্রতিদানও অনেক। হাদীস শরীফে এসেছে, কোনো মানুষ যদি মাত্র একবার মাতা-পিতার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি হজ্জ এবং একটি উমরার সওয়াব দান করবেন।

স্বার্থহীন ভালোবাসা

এ পার্থিব জগতে রয়েছে হাজারো ভালোবাসা। রয়েছে বহু ধরনের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক ও ভালোবাসার মাঝে লুকিয়ে থাকে কোনো না কোনো স্বার্থ, কোনো না কোনো আশা। ভালোবাসার বিচিত্র এ ভুবনে নির্ভেজাল শুধু একটাই। তাহলো সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার মায়া-মমতা। এ মহব্বত তাঁদের স্বভাবজাত। এর মাঝে থাকে না কোনো স্বার্থ, থাকে না কোনো উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্য কোনো মহব্বত বেগরজ নেই, নিঃস্বার্থ নেই। যেমন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে অনেক আশা ও ভরসা। ভাইয়ের সঙ্গে মহব্বত। তাতেও থাকে আদান ও প্রদান। মোটকথা দুনিয়ার সকল সম্পর্ক উদ্দেশ্যমুক্ত দাবি করা যাবে না। কেবল একটি মহব্বত, একটি স্নেহ ও মায়া সকল স্বার্থ থেকে মুক্ত। তাহলো মাতা-পিতার মায়া ও করুণা। মাতা-পিতার মহব্বত একেবারে নির্ভেজাল, সম্পূর্ণ নিখাঁদ। এমন সন্তানের জন্য তাঁদের আবেগ ও জযবা এতবেশি উতলা থাকে, প্রয়োজনে নিজেকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের হকসমূহের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়েও মাতা-পিতার হককে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাতা-পিতার সেবা

হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক ইচ্ছা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবো। উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব প্রাপ্তি। শুধু এ উদ্দেশ্যে আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি সত্যিই সাওয়াবের নিয়তে জিহাদে যেতে চাও? সাহাবী উত্তর দিলেন : জি! আল্লাহর রাসূল! কেবল এটাই আমার উদ্দেশ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মাতা-পিতা কি বেঁচে আছেন? সাহাবী বললেন : হ্যাঁ, তাঁরা জীবিত আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যাও, বাড়িতে ফিরে যাও। মাতা-পিতার খেদমত করো। তুমি মাতা-পিতার খেদমতে যে সাওয়াব পাবে, জিহাদ করে সে সওয়াব পাবে না।

এক বর্ণনায় এসেছে–

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

'যাও, তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে জিহাদ করো।'

এ হাদীসে মাতা-পিতার খেদমতকে জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। [বুখারী শরীফ]

নিজের কামনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি কথা বলতেন। হৃদয়পটে যত্ন করে রাখার মতো কথা। তিনি বলতেন : ভাই! নিজের কামনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়, বরং দ্বীন হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নাম। প্রথমে লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী চান? তার সেটা পূর্ণ করো। এটাই দ্বীন। নিজ আগ্রহ, আবেগ, কামনা-বাসনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। যেমন কারো আগ্রহ সৃষ্টি হলো প্রথম কাতারে নামায পড়ার প্রতি। কারো মনে জাগলো, জিহাদ করবো। কারো মনে চাইলো দাওয়াত-তাবলীগে সময় দিবে। এসব তো অবশ্যই সওয়াবের কাজ। নিঃসন্দেহে এগুলো দ্বীনের কাজ। তবে তোমাকে দেখতে হবে, এ মুহূর্তে দ্বীনের চাহিদা কী? যেমন তোমার মনে চাইলো, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার। অথচ ঘরে তোমার মাতা-পিতা খুবই অসুস্থ। নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছেন না। তাহলে এ মুহূর্তে জামাতে শরীক হওয়ার চেয়েও মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব অধিক। এ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার থেকে এটাই চান। তাই এ মুহূর্তে তোমার কর্তব্য হবে ঘরে একাকি নামায সেরে নেয়া এবং মাতা-পিতার খেদমতে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করা। এ মুহূর্তে যদি মাতা- পিতার খেদমত রেখে তুমি চলে যাও মসজিদে জামাতে শরীক হতে, তাহলে এটার নাম দ্বীন নয়। বরং এটা হবে নিজের কামনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অবশ্য শরীয়তের এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদ হবে দূরবর্তী অবস্থানে। যদি মসজিদ নিকটেই হয়, যেখানে গেলে মা-বাবার খেদমতে অসুবিধা হবে না, তখন মসজিদে যাওয়াই শ্রেয়।

এটা দ্বীন নয়

আমাদের হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) এ সম্পর্কে একটি উপমা পেশ করেছেন। তাহলো, যেমন– জনমানবহীন কোনো এক প্রান্তরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই থাকে। ইত্যবকাশে নামাযের সময় হয়ে গেলো। তাদের অবস্থান থেকে মসজিদ অনেক দূরে। স্বামী তার স্ত্রীকে বললো : নামাযের সময় হয়ে গেছে, আমি মসজিদে যাবো, নামায পড়বো। স্ত্রী এটা শুনে ভয় পেয়ে গেলো, বললেন : তুমি আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে? এখানে তো কেউ নেই। তুমি এভাবে চলে গেলে ভয়ে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তুমি যেও না। স্বামী উত্তর দিলো : জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার ফযীলত অনেক। আমাকে যেতেই হবে, এ ফযীলত অর্জন করতেই হবে। যা হবার তা হবে, আমি যাবোই।

হযরত মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) বলেন : এর নাম দ্বীন নয়। এটা দ্বীনের কাজও নয়। এটা হবে প্রথম কাতারে নামায আদায় করার আশা পূর্ণ করা। কারণ, এ মুহূর্তে দ্বীনের দাবি ছিলো, স্ত্রীকে একা ছেড়ে না যাওয়া এবং মসজিদের

পরিবর্তে ঘরে একাকি নামায পড়ে নেয়া। দ্বীনের এ দাবি যেহেতু উপেক্ষিত হলো, তাই এটা দ্বীন হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য হবে না।

অনুরূপভাবে বাড়িতে যদি মাতা-পিতা অসুস্থ থাকেন, বিবি-বাচ্চা পীড়িত থাকে, যখন তাদের জন্য প্রয়োজন আপনার খেদমত। অথচ আপনার মনে সৃষ্টি হলো তাবলীগে যাওয়ার সাধ। তাই আপনি বলে দিলেন যে, আমি তাবলীগে গেলাম। তাহলে এটা দ্বীন হলো না। হ্যাঁ, তাবলীগে যাওয়া অবশ্যই দ্বীনের কাজ, সওয়াবের কাজ। কিন্তু এ মুহূর্তের দাবি আপনার তাবলীগ নয়, বরং এ মুহূর্তের দাবি হলো খেদমত। এ অবস্থায় মাতা-পিতা কিংবা পরিবারের খেদমত আপনার জন্য তাবলীগের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমও এখন এটাই। তাই আপনাকে অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই হবে দ্বীন। তাহলেই হবে ইতাআত। নিজের মনোবাসনা পূরণ করার নাম তো দ্বীন নয়।

আলোচ্য হাদীসে আপনি লক্ষ্য করেছেন, সাহাবী এসে আরজ করেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন : তোমার জন্য নির্দেশ হলো, বাড়িতে যাও এবং মাতা-পিতার খেদমত করো।

হযরত উয়াইস করনী (রহ.)

হযরত উয়াইস করনী (রহ.) নবীজির যামানায় জীবিত ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন। তাঁর একান্ত বাসনা ছিলো, নবীজির দরবারে গিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করবেন, যাঁর মুলাকাত দুনিয়া সবচে বড় নেয়ামত। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন, তখন এ মহান সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। হযরত উয়াইস করনী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত চাওয়া-পাওয়া আপনার দরবারে হাজির হওয়া। কিন্তু আমার আম্মা অসুস্থ, তাঁর খেদমত প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন : তুমি আমার সাক্ষাতের জন্য এসো না, বরং বাড়িতে থাক এবং মায়ের খেদমত কর।

যাঁর ঈমান ছিলো ইস্পাতের মতো মজবুত, যাঁর অন্তরে তড়প ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় যাঁর হৃদয় বিগলিত ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একনজর দেখার জন্য যিনি ছিলেন মাতোয়ারা। তাই তাঁর হৃদয়ের অবস্থা কতটা পাগলপারা– তা কি কল্পনা করা

যায়! আজকের উম্মতের হৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রতিই দেখুন না! নবীজির একজন উম্মত! কীভাবে কামনা করে রওয়া শরীফের যিয়ারত। অথচ উয়াইস করনী (রহ.) তখন জীবিত। তাহলে তাঁর মনের অবস্থা না জানি কেমন ছিলো! কিন্তু তিনি নিজের মনের বাসনাকে মনেই পুষে রাখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের সামনে নিজের কামনাকে কুরবান করে দিলেন। মায়ের খেদমতের জন্য এই সৌভাগ্য ছেড়ে দিলেন। ফলে তিনি সাহাবী উপাধিতে ভূষিত হতে পারলেন না। অথচ একজন সাধারণ সাহাবার মর্যাদাও এত বেশি যে, একজন ওলী যত বড় ওলীই হোন না কেন, কিন্তু তিনি একজন সাধারণ সাহাবার মর্যাদার কাছেও যেতে পারেন না।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

প্রখ্যাত তাবে-তাবেঈন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন করে বসলো যে, হযরত মুআবিয়া (রা.) উত্তম নাকি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ.) উত্তম। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটির বিন্যাসধারা ছিলো এমন যে, তার প্রশ্নে ফুটে উঠেছে ওই সাহাবীর মর্যাদার কথা, যে সাহাবী সম্পর্কে কিছু লোক সমালোচনার ঝড় তোলে। আহলে সুন্নাতের আকীদা হলো, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে আলী (রা.) ছিলেন হকের উপর। আর মুআবিয়া (রা.)-এর ভুলটি ছিলো ইজতিহাদী ভুল। এ মতটির উপর প্রায় সকলেই ঐক্যমত। যাহোক, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রথম দিকটিতে রয়েছেন ওই সাহাবী, যাঁর সম্পর্কে অনেকে বিতর্কে লিপ্ত। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে রয়েছেন ওই তাবিঈ, যাঁর সততা, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং তাকওয়া-পরহেজগারী ছিলো সর্বজনবিদিত। যাঁকে বলা হতো উমরে সানী। যিনি ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ। আল্লাহ যাঁকে অনেক গুণ ও মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) কী উত্তর দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন : ভাই, তোমার প্রশ্ন হলো, হযরত মুআবিয়া (রা.) এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের মাঝে কে সর্বাধিক উত্তম? শোনো ভাই! হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব তো অনেক দূরের কথা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদ করতে গিয়ে যেসব ধূলিকণা হযরত মুআবিয়ার নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করেছিলো, সেগুলোও হাজার হাজার উমর ইবনে আবদুল আজীজের চেয়েও অনেক উত্তম। কারণ, আল্লাহ হযরত মুআবিয়া (রা.)কে সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। এ মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা যদি মানুষ সারা জীবনও করে, তবুও তার ভাগ্যে জুটবে না।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

মায়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকো

যাহোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইস করনী (রহ.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই। সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তোমার মায়ের খেদমতে থাকা। তাই তুমি মায়ের খেদমতে থাকো। আমাদের মতো নির্বোধ কেউ হলে তো বলে বসতো, সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য তো আর পরে পাওয়া যাবে না। মা অসুস্থ তো কি হয়েছে! এমনিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে হয়। নবীজির সাক্ষাত তো প্রয়োজন। সুতরাং আমি যাবো এবং সাক্ষাত করে আবার চলে আসবো। কিন্তু উয়াইস করনী (রহ.) এমন করেননি। কারণ, নিজের আবেগ কিংবা বাসনা পূরণ করা তাঁদের নিকট মুখ্য বিষয় ছিলো না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালন করা। তাই তিনি নিজের আবেগকে কুরবান করলেন এবং নিজেকে মায়ের খেদমতে নিয়োজিত রাখলেন। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন। উয়াইস করনীর নবীজির মুলাকাত আর নসীব হলো না।

মায়ের খেদমতের পুরস্কার

কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে মায়ের খেদমতের পুরস্কার দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)কে বলে গিয়েছেন : উমর! ইয়ামানের 'করন' নামক স্থান থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় আসবে। তার আকৃতি ও গঠন এ রকম হবে। যদি তুমি তাঁর দেখা পাও, তাহলে তাঁর দ্বারা তোমার জন্য দুআ করাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করবেন।

ইতিহাসে রয়েছে, হযরত উমর (রা.) প্রতিদিন ওই মহান ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকতেন। ইয়ামানের কোনো কাফেলা মদীনাতে প্রবেশ করামাত্র তিনি সেখানে ছুটে যেতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন : কাফেলায় উয়াইস করনী আছে কি? একবার সত্যি সত্যিই এক কাফেলার সঙ্গে উয়াইস করনী আসলেন। উমর (রা.) খুশীতে আন্দোলিত হলেন। তাঁর কাছে নিজেই হাজির হলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গঠনাকৃতি বলেছিলেন, তার সাথে হুবহু মিল খুঁজে পেলেন। তারপর তিনি দরখাস্ত করলেন, আমার জন্য দুআ করুন। উয়াইস করনী (রহ.) বললেন : আমার দুআর জন্য আপনি কেন এত ব্যাকুল হলেন? উমর (রা.) উত্তর দিলেন : এটা আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অছিয়ত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন। উমর (রা.)-এর কাছে এ তথ্য শুনে উয়াইস করনী (রহ.) ঝরঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। তিনি এ বলে অঝোরধারায় কেঁদে চললেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ গৌরব দান করলেন!

দেখুন, হযরত উমর ফারুক (রা.) কত মহান মর্যাদাবান সাহাবী। আর তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে, করনী থেকে নিজের জন্য দুআ করিয়ে নিয়ো। এত বড় মর্যাদা তিনি কিসের ভিত্তিতে পেলেন? এ দৌলত লাভ হয়েছে মায়ের খেদমতের বদৌলতে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের কারণে। উয়াইস করনী (রহ.)-এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশই ছিলো একমাত্র সম্পদ। তিনি বিশাল ত্যাগের মাধ্যমে এ সম্পদ অর্জন করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী

প্রতিজন সাহাবী ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন জানকুরবান মুসলমান। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও যদি কারো জীবন বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম তাও করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি নিঃশ্বাসের বিনিময়ে তাঁরা প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেন। তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এতটা ব্যাকুল ছিলেন যে, তাঁদের নিঃশ্বাসে, বিশ্বাসে ছিলো নবীজিকে পাওয়ার অদম্য স্পৃহা। এমনকি যুদ্ধের কঠিন ময়দানেও তাঁদের এ আবেগ ঝরে পড়তো। ভালোবাসার এ মানুষটিকে তখনও তারা চোখের আড়াল হতে দিতেন না। এক মুহূর্তেরও বিরহ তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

সাহাবী হযরত আবু দুজানা (রা.)। উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে তাঁকে তরবারী তুলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন দুশমনের মোকাবেলায় দাঁড়ালেন, তখন তীরের প্রচণ্ড বৃষ্টি নবীজির দিকে তেড়ে আসছিলো। আবু দুজানা (রা.) তীরবৃষ্টির দিকে পিঠ পেতে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রতিটি তীর তিনি নিজের পিঠে নিতে লাগলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের পিঠকে ঝাঝরা করে দিলেন। শত্রুপক্ষের দিকে তিনি বুক ফেরালেন না। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাবে যে! যুদ্ধের আগুন যখন জ্বলছে, তখনও আবু দুজানার হৃদয়ে দাপাদাপি করছে প্রেমের আগুন। এক মুহূর্তের বিরহ-বেদনা, এ ছিলো তাঁর জন্য অব্যক্ত যাতনা!

মোটকথা তাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে রাসূলের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব প্রাণপ্রিয় সাহাবাকে নিজের কাছে ধরে রাখেননি। কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শামে, কাউকে ইয়ামানে। কাউকে প্রেরণ করেছেন মিশরে। সকলের নিকট তাঁর নির্দেশ ছিলো, পৃথিবীর

আনাচে-কানাচে আমার দ্বীনের পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম যখন এ নির্দেশ পেলেন, তখনই তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলের মুলাকাতকেও তাঁরা কুরবানী দিলেন।

আমাদের হযরত হৃদয়পটে ধরে রাখার মতো একটা কথা বলতেন। তিনি বলতেন : সময়ের দাবিমতে চলার নাম হলো দ্বীন। যে সময় দ্বীনের চাহিদা যা হবে, তাই পালন করতে হবে। সময়ের দাবি যদি হয়– মাতা-পিতার খেদমত করা, তাহলে সে সময়ে জিহাদের কোনো মূল্য নেই, জামাতে নামায পড়ার কোনো অর্থ নেই। এসব ইবাদত যথাস্থানে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। কিন্তু দেখতে হবে, এখন আমাকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতে হবে। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে করার নামই দ্বীন।

মাতা-পিতার খেদমতের ফযীলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাতা-পিতার খেদমত সকল ইবাদতের উপর প্রাধান্য পাবে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে একাধিক আয়াত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

'আর আমি মানব সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজের মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করে।'

অন্য আয়াতে এসেছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

'আপনার প্রভু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।'

এখানে মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের বিষয়টি তাওহীদের সাথে আলোচিত হয়েছে। এ যেন তাওহীদের পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। তাহলো মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হবে

তারপর মহান আল্লাহ উপদেশের ভঙ্গিতে বলেছেন–

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ

'তোমাদের জীবদ্দশায় মাতা-পিতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখন তাঁদের ক্ষেত্রে 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না।'

বার্ধক্যের আলোচনা সবিশেষ করা হয়েছে। কারণ, বার্ধক্যের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। তখন অহেতুক কিংবা ভুল কথা নিয়েও মানুষ বাড়াবাড়ি করতে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে বার্ধক্যের কথা তুলে ধরেছেন। তোমরা মাতা-পিতা এ বয়সে উপনীত হলে অহেতুক কথার অবতারণা করতে পারে কিংবা ভুল অথবা অন্যায় আচরণও দেখাতে পারে। এটা অসম্ভব কোনো কিছু নয়। তবে তোমার কর্তব্য হলো, তাঁদের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনো বিরক্তি কিংবা অনীহা প্রকাশ করবে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন–

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

'তাঁদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দিবে। আর এই দুআ করতে থাকবে, 'হে আল্লাহ! তাঁদের উপর রহম করুন, যেভাবে তাঁরা শিশুকালে আমাকে দয়া করে প্রতিপালন করেছেন।'

বৃদ্ধকালে মেজাযে রুক্ষতা চলে আসে, তাই বিশেষভাবে বৃদ্ধকালের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্যথায় মাতা-পিতা সর্বাবস্থায় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। তাঁদের কার্যকলাপে কখনও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত নয়।

শিক্ষণীয় ঘটনা

পড়েছিলাম কোনো এক বইয়ে। জানি না ঘটনাটি সত্য না মিথ্যা। তবে এটি শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক চমৎকার একটি ঘটনা। এক বৃদ্ধ ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। বৃদ্ধ একদিন ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে একটি কাক উড়ে এসে ঘরের দেওয়ালে বসল। বৃদ্ধ নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন : বাবা! এটা কী? ছেলে বললেন : আব্বা! এটা একটা কাক। খানিক পর বৃদ্ধ আবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন : বাবা! এটা কী? ছেলে এবারও উত্তর দিলো : আব্বা! এটা একটা কাক। আরো কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ পিতা আবার জিজ্ঞেস করলেন : বাবা! এটা কী? ছেলে উত্তর দিলো : আব্বাজান! একটু আগেই তো বললাম, এটা একটা কাক। আবার কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন : বাবা! এটা কী? এবার ছেলে চটে গেলো। তার স্বরে পরিবর্তন দেখা দিলো। সে ধমকের সুরে উত্তর দিলো : কাক, কাক। বৃদ্ধ পিতা আবার একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করে বসলেন : বাবা! এটা কী? এবার ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। সে ধমকের সুরে বললো, একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন! হাজারবার বলেছি, এটা একটা কাক।

এতবার বলার পরেও আপনার বুঝে আসে না? এভাবে ছেলে বৃদ্ধ পিতাকে শাসাতে লাগলো। একটু পর বৃদ্ধ সেখানে থেকে উঠে গেলেন। কামরায় গিয়ে একটি পুরাতন ডায়রী বের করলেন। ডায়রীর একটি পাতা খুলে ছেলের কাছে আসলেন। বললেন : বাবা! এ পাতাটি একটু পড়ো। দেখো, এখানে আমি কী লিখেছি? ছেলে পড়তে লাগলো। দেখলো, লেখা আছে যে, আজ বারান্দায় বসা ছিলো আমার ছোট ছেলে। আমিও বসা ছিলাম। ইত্যবসরে একটি কাক আসলো। ছেলে আমাকে পঁয়ত্রিশবার জিজ্ঞেস করলো : আব্বাজান! এটা কী? আমিও পঁয়ত্রিশবারই উত্তর দিয়েছি যে, বাবা! এটা একটা কাক। যতবারই সে প্রশ্ন করেছে, ততবারই আমার কাছে ভালো লেগেছে। ছেলে লেখাটি পড়া শেষ হলে পিতা বললেন : বৎস! দেখ, পিতা আর সন্তানের মাঝে পার্থক্য এখানেই। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন পঁয়ত্রিশবার আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলে। আর আমিও আনন্দচিত্তে, শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলাম। অথচ আজ আমি মাত্র পাঁচবার জিজ্ঞেস করলাম আর এতেই তুমি রেগে গেলে!

মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : মনে রেখো, বুড়ো হয়ে গেলে মাতা-পিতার মাঝে খিটখিটে মেজায চলে আসা স্বাভাবিক। তাঁদের অনেক কথা তখন মনে হবে বিরক্তিকর ও অহেতুক। তখন মনে রাখতে হবে, এর চেয়েও বিরক্তিকর ও অহেতুক কথা তোমার ছোটবেলায় তাঁরা সহ্য করেছেন। সুতরাং তোমরাও তাঁদের অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা সহ্য করতে হবে। এমনকি যদি তাঁরা কাফেরও হয়, তবুও পবিত্র কুরআনের বক্তব্য শুনুন–

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

'তোমাদের মাতা-পিতা যদি কাফের-মুশরিক হন, তাহলে এ গর্হিত কাজে তোমরা তাঁদের অনুসরণ করবে না। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপনে তখনও তোমরা তাঁদের কথাবার্তা মেনে চলতে হবে।' কারণ, তাঁরা কাফের হলেও তো তোমার আব্বা, তোমার আম্মা।

মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণের জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার স্রোত চলেছে উল্টো দিকে। চলছে নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সন্তানের হৃদয় থেকে মুছে ফেলার প্রশিক্ষণ। বলা হচ্ছে, মাতা-পিতা মানুষ, আমরাও মানুষ। আমাদের

মাঝে এবং তাদের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। আমাদের উপর তাদের আবার কিসের অধিকার? মানুষ যখন দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাঝে যখন ত্রুটি দেখা দেয়, যখন আখেরাত ভাবনা মানুষ থেকে উঠে যায়, তখনই বের হতে পারে এ জাতীয় জঘন্য কথা। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

মাতা-পিতার নাফরমানী

মাতা-পিতার আনুগত্য ওয়াজিব। তাঁদের আদেশ-নিষেধ সন্তানের জন্য অপরিহার্য। এটা শরীয়তের বিধান। নামায-রোযার মতোই একটি অপরিহার্য বিধান। তবে এখানে একটা শর্ত আছে। তাহলো মাতা-পিতার নির্দেশ হতে হবে ইসলামের গণ্ডির ভেতরে। ইসলামের গণ্ডি থেকে যদি মাতা-পিতা কোনো নির্দেশ দেন, তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব। পালন না করলে ঠিক এমন গুনাহ হবে, যেমন গুনাহ হয় নামায ছেড়ে দিলে। একেই বলা হয়, মাতা-পিতার নাফরমানী। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন : মাতা-পিতার নাফরমানীর শাস্তি হলো, মৃত্যুকালে কালিমা নসীব হবে না।

উপদেশমূলক কাহিনী

এক লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তখন উপস্থিত লোকজন বারবার চেষ্টা করছিলেন তার মুখ থেকে কালিমা বের করার। সবাই বে-কারার, অথচ তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। তাঁরা নিরুপায় হয়ে এক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বৃত্তান্ত খুলে বললেন। বুযুর্গ পরামর্শ দিলেন, তার মাতা-পিতা কেউ জীবিত থাকলে লোকটিকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁদের মাধ্যমে মুক্তির দুআ করাও। মনে হয়, সে নিজের মাতা-পিতার নাফরমানী করেছে। যার ফলে তার উপর এ শাস্তি নেমে এসেছে। তাঁদের পক্ষ থেকে মাফ না হওয়া পর্যন্ত মনে হয় এর মুখে কালিমা আসবে না।

বোঝা গেলো, মাতা-পিতার নাফরমানী, তাঁদের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া জঘন্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। কোনো সাহাবী তাঁর কাছে পরামর্শের জন্যে এলে তিনি মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন।

ইলম শিক্ষার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি

আমাদের এখানে (দারুল উলূমে) অনেক ছাত্র ভর্তি হতে আসতো। ইলমের শিক্ষার প্রতি যাদের স্পৃহা ছিলো তীব্র। কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, মাতা-পিতার কাছ থেকে কি অনুমতি নিয়ে এসেছ? তখন জানা যায়, তারা অনুমতি ছাড়াই এসেছে। তারা ওজর পেশ করে বলে, কী করবো, মা-বাবার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাদেরকে বলি, মৌলভী হওয়া কোনো ফরয নয়। মাতা-পিতাকে মেনে চলা ফরয। ইলম তোমার জন্য কেবল ততটুকু ফরয, যতটুকু না হলে ইসলামের উপর চলা যাবে না। যেমন নামায পড়ার নিয়ম-কানুন জানা তোমার জন্য ফরয। এতটুকু ইলম অর্জনে যদি তোমার মাতা-পিতা বাধা দেন, তাহলে তখন মাতা-পিতার কথা না মানলেও চলবে। কিন্তু মৌলভী হওয়া তো ফরয নয়। সুতরাং মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া তোমার মৌলভী হওয়ার খাহেশ পুরা করা জরুরী নয়। আমার হযরতের ভাষ্যমতে, তখন তা হবে খাহেশ পূর্ণ করা। তখন তো দ্বীনের কাজ হবে না। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

বেহেশতের সহজ পথ

মনে রাখবেন, যতদিন মাতা-পিতা জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁরা আপনার জন্য মহান নেয়ামত, যে নেয়ামতের তুলনা দুনিয়াতে আর নেই। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি মহব্বতের সাথে একবার মাতা-পিতার প্রতি তাকাও, তাহলে একটি হজ্জ এবং একটি উমরার সওয়াব পাবে। এজন্য অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, দুর্ভাগা ওই ব্যক্তি, যে নিজের মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে; অথচ নিজের গুনাহ মাফ করাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, মাতা-পিতা বৃদ্ধ হলে সন্তান ইচ্ছা করলে, তাঁদের খেদমত করে সহজেই যেতে পারে বেহেশতে। তাঁদের স মান্য দুআ তোমার আখেরাতকে করে তুলবে নুরান্বিত। তাই মাতা-পিতা জীবিত থাকলে এ নেয়ামতের মূল্যায়ন করো। তাঁরা যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, তখন বুঝে আসবে তাঁদের কদর। তখন হায় আফসোস করলেও কোনো কাজ হবে না। তাঁরা জীবিত থাকাকালে বেহেশত লাভ ছিলো তোমার জন্য খুবই সহজ। তাঁদের মৃত্যুর পর যা হয়ে পড়বে খুবই কঠিন। তখন শত আফসোস বৃথা যাবে। তাই সময় থাকতে তাঁদের কদর করো।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর অনুভূতি জাগে, হায়! কত বড় নেয়ামত আমরা হারিয়ে ফেললাম। আমরা তার কদর করতে পারলাম না। এমন অনুভূতিসম্পন্ন লোকের জন্য আল্লাহ তাআলা একটা ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে, কেউ যদি মাতা-পিতার হক আদায়ে ত্রুটি করে থাকে, তাঁদের থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলে, তবে এর

ক্ষতিপূরণের দুটি পথ আছে। এক. তাঁদের জন্য বেশি বেশি ঈসালে সওয়াব করবে। দান-খয়রাত করে নফল নামায পড়ে তাঁদের জন্য সাধ্যানুযায়ী সওয়াব পাঠাতে থাকবে। এর মাধ্যমে পূর্বের ক্রটির ক্ষতিপূরণ করবে। দুই. মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের সঙ্গে সদাচরণ করবে। পিতা-মাতার সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত ছিলো, তাঁদের সাথে তেমন ব্যবহার করবে। এর ফলে আল্লাহ তাআলা পূর্বে ক্রটির ক্ষতিপূরণ দিবেন। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাতার তিন হক এবং পিতার এক হক

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِىْ؟ قَالَ : اُمُّكَ - قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : اُمُّكَ - قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : اُمُّكَ - قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : اَبُوْكَ (جَامِعُ الْاُصُوْلِ)

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচে বেশি হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন : তোমার মা। অর্থাৎ– সবচে বেশি হকদার তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো : তারপর কে? নবীজি উত্তর দিলেন : তোমার মা। লোকটি আবারও প্রশ্ন করলেন : তারপর কে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও উত্তর দিলেন : তোমার মা। লোকটি চতুর্থবারেও একই প্রশ্ন করলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কে? এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার পিতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার মায়ের কথা বলেছেন। চতুর্থবারে পিতার কথা বলেছেন। তাই এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন : পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশি। কারণ, সন্তানের লালন-পালনে মায়ের ভূমিকা এবং কষ্ট পিতার চেয়েও বেশি। পিতা মায়ের চার ভাগের এক ভাগ কষ্টও করেন না। বিধায় মায়ের নাম নেওয়া হয়েছে তিনবার আর পিতার নাম নেওয়া হয়েছে একবার।

পিতার আযমত, মায়ের খেদমত

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন : পিতার তুলনায় মাতা হাদিয়া পাওয়ার অধিক উপযোগী। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন : এখানে মূলত বিষয় দুইটি। এক হলো আযমত তথা মর্যাদাপ্রদর্শন। দ্বিতীয় হলো খেদমত ও সদাচরণ। প্রথম বিষয়টিতে পিতা প্রাধান্য পাবে। দ্বিতীয় বিষয়টিতে মাতা প্রাধান্য পাবে। তাজিমের অর্থ হলো, পিতার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আযমত অন্তরে থাকা। যেমন পিতার দিকে পা ছড়িয়ে বসবে না। তাঁর মাথার নিকট বসবে। এছাড়া আদবের জন্য আরো যা করতে হয় সবগুলো করবে। এক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে। আর খেদমতের ব্যাপারে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে। এমনকি পিতার চেয়েও তিন গুণ বেশি। এ আল্লাহর বিশেষ কুদরতের আলামত যে, সন্তান মায়ের মাঝে এক বিশেষ গুণ রেখেছেন। যে গুণের কারণে সন্তান মায়ের সাথে যতটুকু ফ্রি থাকে, পিতার সাথে ততটুকু ফ্রি থাকে না, মায়ের সাথে সন্তানের আন্তরিকতা বেশি বিধায় এমন অনেক কথা আছে যা পিতার সামনে বলা যায় না। অথচ মায়ের কাছে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারীতে বুযুর্গানে দ্বীনের এ মূলনীতির আলোচনা করেছেন যে, পিতার আযমত হবে বেশি আর মায়ের খেদমত হবে বেশি। এ মূলনীতিটির মাধ্যমে হাদীস শরীফেরও সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে ওঠে।

মায়ের খেদমতের ফল

মায়ের খেদমত অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। যার মাধ্যমে মানুষ উঁচু থেকে আরো উঁচু হয়। যেমন হযরত উয়াইস করনীর (রহ.) ঘটনায় বিষয়টি দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। আরো অনেক বুযুর্গ সম্পর্কেও এ জাতীয় ঘটনা আছে। যেমন ইমাম গাযযালী (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি দীর্ঘদিন কেবল মায়ের খেদমতের কারণে ইলম অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু যখন মায়ের খেদমত থেকে অবসর হলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলমী জগতের উজ্জ্বল পুরুষ বানিয়ে দিলেন। তাই মাতা-পিতার খেদমত অবশ্যই এক মহান সম্পদ।

ফিরে যাও, তাঁদের খেদমত করো

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، وَاَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى - فَقَالَ : هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا - قَالَ : فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ : نَعَمْ - قَالَ : فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (مُسْنَدُ اَحْمَد)

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : এক লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুটি বিষয়ের উপর বায়আত গ্রহণ করতে এসেছি। একটি হলো হিজরত। অপরটি হলো জিহাদ। অর্থাৎ– আমি নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছি। মদীনায় বসবাস করা ইচ্ছা আমার। আর উদ্দেশ্য হলো, আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশা করি সওয়াব লাভের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতা-মাতা কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি জানালো : তাঁরা উভয়ই জীবিত আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আসলেই কি তুমি সওয়াব চাও? লোকটি উত্তর দিলো : হ্যাঁ, আসলেই আমি সওয়াব চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তুমি মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের খেদমত করো।

তাঁদের মুখে হাসি ফোটাও

মূলত হাদীসটিতে জিহাদের ফযীলতকে মাতা-পিতার খেদমতের কাছে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। লোকটিকে মাতা-পিতার খেদমতে ফেরত দেয়া হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার জিহাদের প্রস্তুতি চলছিলো। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি এসেছি জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। লোকটি গৌরবের সঙ্গে আরো জানালো : জিহাদে শরীক হওয়ার তামান্না আমার মাঝে এত বেশি যে, এর জন্য মাতা-পিতার কান্নাকেও উপেক্ষা করেছি। অর্থাৎ– আমার মা-বাবা চান না, আমি জিহাদে শরীক হই। এতে তারা খুশি হন। তাই তাঁরা আমাকে জিহাদের অনুমতি দিচ্ছেন না। তবুও আমি জিহাদের উদ্দেশ্যে চলে এসেছি। আমার বিয়োগবেদনায় তাঁর কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

اِرْجِعْ فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا (مُسْنَدُ اَحْمَد)

'ফিরে যাও, তাদের মুখে হাসি ফোটাও, যেমন তাদের কাঁদিয়েছিলে। আমার সঙ্গে তোমার জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই।'

শরীয়তের পরিসীমায় চলার নাম দ্বীন

এর নাম 'হিফযে হুদুদ' তথা সীমানা রক্ষা করা এবং সে-মতে চলা। এজন্য আমাদের শায়খ বলতেন : দ্বীন হলো হিফযে হুদুদের নাম। জিহাদের

ফযীলতের কথা শুনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার নাম দ্বীন নয়। বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলার নাম দ্বীন। আমার মুহতারাম আব্বাজান বলতেন : বর্তমানে মানুষ এক লাগামছাড়া হয়ে গিয়েছে। যেমন ঘোড়ার একটি লাগাম যদি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে কেবল একদিকে দৌড়ে বেড়ায়। অন্যদিকে আর তার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অনুরূপভাবে মানুষও আজ এক লাগাম নিয়ে চলছে। যখন কোনো কাজের ফযীলতের কথা শোনে, তখন মানুষ শুধু ওই দিকেই দৌড় দেয়। অন্যদিকে আর খেয়াল করে না। তার আরো বড় যিম্মাদারী পড়ে আছে– এটার প্রতি কোনো লক্ষ্য করে না। অথচ একজন মানুষের সবদিক খেয়াল করেই চলা উচিত।

মুত্তাকীদের সুহবত

হিফযে হুদুদ অর্জন হয় কোনো আল্লাহ তাআলার সুহবতে থাকলে। কোনো আল্লাহওয়ালা শায়খে কামেলের সংশ্রব ছাড়া এ দৌলত অর্জন করা যায় না। অন্যথায় আমি মুখে বলে দিলাম, কিতাবেও লেখা পেলাম, আপনারাও শুনে নিলেন হিফযে হুদুদের কথা। তথা কোন অবস্থায় কীভাবে চলতে হবে, কোন স্থানে কোনটাকে প্রাধান্য দিতে হবে, কোন কাজ কম-বেশি করতে হবে– এগুলোকে বলা হয় হিফযে হুদুদ। এসব কিছু সঠিকভাবে বলতে পারবেন একজন কামেল বুযুর্গ। কামেল শায়খ ছাড়া এসব বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দরবারে আত্মশুদ্ধির জন্য কেউ গেলে, অনেক সময় তিনি ওজীফা বন্ধ করে অন্য কাজে লাগিয়ে দিতেন। যেহেতু তিনি বুঝতেন, এ লোককে ওযীফায় কাজ হবে না, তাকে অন্য কাজে লাগাতে হবে।

শরীয়ত, সুন্নাত, তরিকত

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : حُقُوق হলো সম্পূর্ণ শরীয়ত। অর্থাৎ– হকসমূহের নাম হলো শরীয়ত। এতে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয়ই শামিল। আর حُدُود (হুদুদ) হলো সকল সুন্নাত। তথা সুন্নাতের মাধ্যমে জানা যায় কোন হকের পরিসীমা কতটুকু। আল্লাহর হক কতটুকু এবং বান্দার হক কতটুকু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মাপকাঠিতে নির্ণয় করতে হবে কোন হকের জন্য কী পরিমাণ আমল করতে হবে। আর হিফযে হুদুদ তথা শরীয়তের সীমার হেফাযত হলো মূলত

খুতুবাত-৪/৪

তরিকত। তরিকতের অপর নাম তাসাউফ বা সুলুক। সুলুক বলা হয়, সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আমলের নাম। সারকথা হলো, শরীয়ত মানে সকল হুকুক। সুন্নাত মানে সকল হুদুদ। আর তরিকত মানে হুদুদের হেফাযত। এ তিনটি জিনিস এসে গেলে অন্য কিছুর আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এসব বিষয় সাধারণত আল্লাহওয়ালার সুহবত ছাড়া অর্জন হয় না।

কবির ভাষায়–

قال را بگزار صاحب حال شد

پیش مردے کامل پامال شد

* 'যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে কোনো কামেল পীরের কাছে সোপর্দ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো হাসিল হবে না।'

কামেল পীরের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে কম-বেশির জালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। কখনো এদিকে ঝুঁকে যাবে, কখনো ওই দিকে ঝুঁকে যাবে। তাসাউফের মূল কথা হলো, মানুষকে বাড়াবাড়ি কিংবা কমাকমি থেকে রক্ষা করা। স্বাভাবিক অবস্থার উপর নিয়ে আসা। ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার রাজপথে নিয়ে আসা এবং তাকে এ নির্দেশনা দেওয়া যে, কোন সময়ের দাবি কী? দ্বীনের দাবি এবং চাহিদামাফিক চলার নামই দ্বীনদারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"গীবত একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। যেমন মদ পান করা কবীরা গুনাহ। মদ পান করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে গীবত করাও হারাম। অথচ আমরা মদ পান করাকে হারাম মনে করি, কিন্তু গীবতকে অনুরূপ হারাম মনে করি না— এ কারণ কী? গীবতও তো একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ॥ হারাম। বরং হাদীস শরীফে এসেছে, যিনার চাইতে অধিক জঘন্য গীবতের গুনাহ।"

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ ١٢)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

গীবত একটি জঘন্য গুনাহ

ইমাম নববী (রহ.) যবান থেকে নিঃসৃত গুনাহর আলোচনা শুরু করেছেন। প্রথমেই তিনি এমন একটি গুনাহের কথা আনলেন, যা আমাদের মাঝে ব্যাপক। গুনাহটির নাম গীবত। এটি জঘন্যতম এক মহামারি, যার অশুভ গ্রাস থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত নয়। আমাদের কোনো আলোচনা, কোনো মজলিস এ জঘন্য পাপ থেকে মুক্ত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেছেন। কুরআন মাজীদে গীবত সম্পর্কে কঠোর শব্দ এসেছে। সম্ভবত এরূপ কোনো শব্দ অন্য কোনো গুনাহ সম্পর্কে উচ্চারিত হয়নি। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

"তোমরা একে অপরের গীবত বা পরনিন্দা করো না। (কারণ, এটি জঘন্য পাপ। আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতই জঘন্য পাপ) তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? (নিশ্চয় তা পছন্দ করে না! ভাববে, এ তো বিকৃত কথা) সুতরাং তোমরা গীবতকেও ঘৃণা করো।"

লক্ষ্য করুন, আয়াতটির অন্তর্নিহিত মর্ম নিয়ে ভাবুন। কত কুৎসিত কাজ এই গীবত! একে তো মানুষের গোশত খাওয়া, তার উপর আপন ভাইয়ের গোশত, তাও আবার মৃত– কত বড় জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ! অবর্ণনীয় মন্দ কাজ। অনুরূপভাবে গীবতও একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য গুনাহের নাম।

গীবত কাকে বলে?

গীবত অর্থ পরনিন্দা। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ক্রটি আলোচনা করা। হতে পারে দোষটি তার মধ্যে আছে। কিন্তু এ আলোচিত দোষটির কথা শুনলে সে নির্ঘাত মনে ব্যথা পাবে। তাহলে এটাই গীবত। হাদীস শরীফে এক সাহাবীর কথা এসেছে, যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কাকে বলে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন : আপন ভাইয়ের আলোচনা তার পেছনে এমনভাবে করা, যা তার নিকট পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ– সে পরবর্তীতে যদি জানতে পারে, তার সম্পর্কে অমুক মজলিসে এ আলোচনা হয়েছে, তাহলে মনো কষ্ট পাবে। এটাই গীবত। সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : আমি যে দোষ নিয়ে আলোচনা করেছি, তা যদি সত্য সত্যই আমার ভাইয়ের মাঝে থাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আসলেই যদি দোষ থাকে, তাহলেই গীবত হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার হবে। এতে গুনাহ হবে দ্বিগুণ। [আবু দাউদ, বাবুল গীবত : ৪৮৭৪]

লক্ষ্য করুন, আমাদের আলোচনা সভা-সমিতির প্রতি একটু চোখ বুলিয়ে দেখুন। কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এ মহামারি। দিবা-নিশি এ পাপকাজে আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত করুন। অনেকে গীবতকে বৈধতার পোশাক পরাতে চায়। বলে থাকে, আমি গীবত করছি না, বরং কথাটি আমি তার মুখের উপরও বলে দিতে পারবো। সুতরাং এটা তার পেছনেও বলতে পারবো। জেনে রাখুন, গীবত গীবতই। মুখের উপর বলতে পারা আর না পারার বিষয় এখানে বিবেচ্য নয়। কারো দোষ-ক্রটি তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করলেই তা গীবত হবে, যা একটি কবীরা গুনাহ– মহা পাপ।

গীবত করাও কবীরা গুনাহ

মদপান, ডাকাতি এবং ব্যভিচার যেমনিভাবে কবীরা গুনাহ, তেমনিভাবে গীবতও কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য এগুলোর মাঝে নেই। অন্যান্য কবীরা গুনাহর মতোই গীবতও নিঃসন্দেহে একটি হারাম কাজ। বরং গীবত আরো জঘন্য। যেহেতু এটি হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হুকুকুল ইবাদ একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যার সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হবে না। অন্যান্য গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু গীবতের বেলায় শুধু তাওবা যথেষ্ট নয়; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও ক্ষমা করে দিতে হবে। এবার অনুধাবন করুন, গীবত করা কত বড় গুনাহ। আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন যে, কারো গীবত করবো না, কারো গীবত শুনবো না। কোনো মজলিসে গীবত শুরু হলে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেবো। আলোচনার মোড় পাল্টাতে না পারলে মজলিস ছেড়ে চলে যাবো। যেহেতু গীবত করাও হারাম, শোনাও হারাম।

গীবতকারী নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَآءِ يَا جِبْرَائِيْلُ؟ قَالَ : هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ أَعْرَاضِهِمْ

সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম। সুদীর্ঘ দশ বছর নবীজির খেদমত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিরাজ রজনীতে যখন আমাকে উর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন (দোযখে ভ্রমণকালে) আমাকে এমন কিছু লোক দেখানো হয়েছিলো, যারা নিজেদের নখরাঘাতে মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ থেকে রক্ত ঝরাচ্ছিলো। আমি জিবরাঈল [আ.]কে জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? জিবরাঈল [আ.] বললেন : এরা ওইসব লোক, যারা মানুষের গোশত খেতো অর্থাৎ গীবত করতো। আর মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রমে আঘাত হানতো। [আবু দাউদ : ৪৮৭৮]

ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জঘন্যতম গুনাহর কথা সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। এজন্য এ সুবাদে আলোচনা করতে হলে সবক'টি হাদীস সামনে রাখা প্রয়োজন, যেন এর ভয়াবহতা ও কদর্যতা আমাদের হৃদয়ে বসে যায়। আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে গুনাহটির ভয়াবহতা আমাদের অন্তরে বসিয়ে দিন এবং জঘন্য গুনাহটি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহতা আপনারা নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন যে, গীবতকারী আখিরাতে স্বীয় মুখমণ্ডল খামচাবে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (হাদীসটি সনদের দিক থেকে তেমন মজবুত না হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গীবতের গুনাহ যিনা বা ব্যভিচারের গুনাহর চেয়েও জঘন্য। এর কারণ? যেহেতু আল্লাহ না করুন কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিলে খোদা চাহেন তো গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গীবত এক মারাত্মক গুনাহ। এ গুনাহর ক্ষমা ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা করে দেয়। সুতরাং ভেবে দেখুন, গীবতের গুনাহ কত মারাত্মক!

[মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বাবুল গীবত, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯১]

গীবতকারীকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয়া হবে

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন : গীবতের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা দুনিয়াতে হয়ত বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেককার হবে। নামায পড়বে, রোযা রাখবে, অন্যান্য ইবাদতও করবে। কিন্তু পুলসিরাত পার হওয়ার সময় তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। পুলসিরাতের কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলের নাম পুলসিরাত। পরকালে সকলকেই ওই পুল পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতী হলে পুলসিরাত সহজেই জয় করে নিবে। আর জাহান্নামী হলে তাকে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। গীবতকারীরাও এরূপ পরিস্থিতির শিকার হবে। তাদেরকে পুলসিরাত পাড়ি দেয়া থেকে বাধা প্রদান করা হবে। বলা হবে, তোমরা পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে না। পাড়ি দিতে হলে গীবতের কাফফারা আদায় করে যাও। তারপর পাড়ি দাও। গীবতের কাফফারা মানে যাদের গীবত করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তারা ক্ষমা করলে পুলসিরাত পার হতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

জঘন্যতম সুদ

এমনকি একটি হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদ একটি মহাপাপ। অসংখ্য গুনাহর সমষ্টি এটি। সুদের সবচে ছোট গুনাহ (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) আপন মায়ের সাথে যিনা করার মতো। লক্ষ্য করুন, সুদ সম্পর্কে এরূপ কঠোরবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অন্য কোনো গুনাহর কথা এত কঠোরভাবে বলা হয়নি। নবীজি বলেন : সেই সুদের মধ্য থেকে সবচে জঘন্য সুদ হলো, অপর মুসলমান ভাইয়ের মান-মর্যাদাকে আহত করা। অর্থাৎ– গীবত করা। [আবু দাউদ, বাবুল গীবত, হাদীস নং ৪৮৭৬]

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া

নবীযুগের দু'জন মহিলার ঘটনা হাদীস শরীফে এসেছে। তারা রোযা রেখেছিলো। রোযা অবস্থায় পরস্পর গল্পগুজবে লিপ্ত হলো। এক পর্যায়ে অন্যের গীবতও শুরু করে দিলো। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলো : হে আল্লাহর রাসূল! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিলো, তাদের অবস্থা এখন নিতান্ত নাজুক। পিপাসায় তাদের কলজে ফেটে যাচ্ছে। হয়তো তারা মারাই যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত অহীর মাধ্যমে আগেই জেনেছেন যে, মহিলাদ্বয় এতক্ষণ গীবত করছিলো। তিনি বললেন : তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসো। কথামতো তাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করা হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, সত্য সত্যই তারা মৃতপ্রায়।

নবীজি বললেন : একটি বড় পাত্র নিয়ে আসো। পাত্র আনা হলো। নবীজি দু'জন মহিলা থেকে একজনকে নির্দেশ করলেন : পাত্রটিতে বমি করো। মহিলা যখন বমি করা শুরু করলো, দেখা গেলো এক অবাক কাণ্ড! বমির সাথে রক্ত-পুঁজ ও গোশতের টুকরা উগলে পড়ছে। তারপর দ্বিতীয় মহিলাকেও তিনি একই আদেশ করলেন। দেখা গেলো, সেও রক্ত-পুঁজ ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত বমি করছে। এক পর্যায়ে পাত্র সম্পূর্ণ ভরে গেলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন : এসব তোমাদের ভাই-বোনের রক্ত, পুঁজ ও গোশত। রোযা অবস্থায় তোমরা এগুলো খেয়েছিলে। অর্থাৎ– তাদের গীবত করছিলে। রোযা রাখার কারণে তো তোমরা বৈধ খাবারও পরিহার করেছিলে। অথচ হারাম খাবার তথা গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের রক্ত, পুঁজ ও গোশত ভক্ষণ তোমরা পরিহার করতে পারনি। এগুলো খেয়ে তোমাদের পেট ভরে গিয়েছিলো। ফলে তোমরা আজ এ দুরাবস্থার শিকার হয়েছিলে। যাও, ভবিষ্যতে

কখনও আর গীবত করবে না। উক্ত ঘটনা আমাদের জন্য নিশ্চয় শিক্ষাপ্রদ। গীবতের রূপক নমুনাও আল্লাহ মানুষকে দেখালেন। গীবতের পরিণাম কত বীভৎস! কত ভয়াবহ!

আসলে আমাদের রুচির বিকৃতি ঘটেছে। অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। পাপের ভয়াবহতা ও গুনাহর বীভৎসতা আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাদের অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক অনুভূতি দান করেছেন, তাদেরকে গুনাহের পরিণতি কখনও কখনও দেখিয়েও দেন।

একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত রাবিয়ী নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এক মজলিসে গিয়ে দেখতে পেলাম, লোকজন খোশগল্প করছে। আমিও তাদের সাথে বসে পড়লাম। গল্প জমে উঠলো, গীবতও শুরু হয়ে গেলো। বিষয়টি আমার নিকট ভালো লাগলো না। তাই আমি উঠে গেলাম। কারণ, ইসলামের বিধান হলো, মজলিসে গীবত চললে– পারলে বাধা দিবে। না পারলে মজলিস থেকে উঠে চলে যাবে। আমি উঠে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ভাবলাম, এতক্ষণে হয়ত গীবত শেষ হয়ে গেছে। কারো দোষচর্চা আর চলছে না। সুতরাং আলোচনায় পুনরায় শরীক হওয়া যায়। এই ভেবে আমি পুনরায় মজলিসে গিয়ে বসলাম। অল্প সময় এটা-সেটা আলোচনা চললো। তারপরই শুরু হলো গীবত। আমিও মজা পেয়ে গেলাম। আগ্রহের সাথে তাদের গীবত শুনতে লাগলাম। একপর্যায়ে নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। দু-চারটি গীবত নিজেও করে ফেললাম। মজলিস শেষে বাড়িতে ফিরে আসলাম। রাতে ঘুমের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। এক বীভৎস কালো লোক আমার জন্য পাত্রে করে গোশত নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, শূকরের গোশত। লোকটি বললো : এটা শূকরের গোশত, খাও। আমি বললাম : কীভাবে খাবো; আমি তো মুসলমান! লোকটি বললো : না, ওসব আমি শুনি না। তোমাকে খেতেই হবে। এই বলে লোকটি জোর করে আমার মুখে গোশত পুরে দেওয়া শুরু করে দিলো। আমি তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। বমি করতে চাইলাম, তবুও রক্ষা পেলাম না। সে আমার উপর এই নির্মম অত্যাচার করেই যাচ্ছিলো। সে কি কষ্ট! এরই মধ্যে আমার চোখ খুলে গেলো। তারপর থেকে আমি যখনই আহার করার জন্য বসতাম, ঘটনাটি মনে পড়ে যেতো। কেমন যেন স্বপ্নের সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগতো। এই অবস্থা ত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলো। খাবার গ্রহণে আমার খুব কষ্ট হতো।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সতর্ক করলেন। কেবল একটি মজলিসের দু'-চারটি গীবত এত ভয়ঙ্কর। দীর্ঘ ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমি এর ভয়াবহতার গন্ধ পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে গীবত করা ও শোনা থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

হারাম খাদ্যের কলুষতা

আসলে পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে, ফলে আমাদের বোধশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই পাপকে এখন আর পাপ মনে হয় না। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) বলেছিলেন : একবার একটি দাওয়াতে সন্দেহযুক্ত কিছু খাবার খেয়ে ফেলেছিলাম। সুদীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত এর কলুষতা আমার অন্তরে অনুভূত হয়েছে। কারণ, যা খেয়েছিলাম তা হালাল কি-না সন্দেহ ছিলো। তারপর থেকে বারবার অন্তরে খারাপ চিন্তা আসতো। গুনাহ করার ইচ্ছা জাগতো। গুনাহর প্রতি আকর্ষণ অনুভব হতো।

গুনাহর ফল এটি। গুনাহ গুনাহকে টানে। প্রতিটি গুনাহ অন্তরকে কদর্য ও তমসাচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে গুনাহর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পাপ কাজে ব্রতী হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতিকে সুস্থ করে দিন। আমীন।

মোটকথা গীবত খুবই মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ যাকে সুস্থ বিবেক দিয়েছেন, সেই অনুধাবন করতে পারে যে, কত বড় জঘন্য গুনাহতে আমি লিপ্ত।

যেসব ক্ষেত্রে গীবত জায়েয

গীবতের সংজ্ঞা তো আপনাদের অজানা নয়। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করা। বাস্তবে দোষ থাকুক বা না থাকুক সে শুনলে অবশ্যই মনোকষ্ট পাবে। এটাই তো গীবতের সংজ্ঞা। এ সুবাদে আমরা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। প্রতিটি জিনিসের স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম বিধান প্রণয়ন করেছে। মানুষের স্বভাব ও চাহিদার প্রতিও ইসলাম বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। তদনুযায়ী বিধান প্রদান করেছে। এরই নিমিত্তে ইসলাম কয়েকটি বিষয়কে গীবতের আওতামুক্ত রেখেছে। বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হবে, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলো বৈধ।

কারো অনিষ্ঠতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গীবত করা যাবে

যেমন কেউ এমন কাজ করছে, যার দ্বারা অন্য লোকের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে এটা ষড়যন্ত্র। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে অবহিত না

করলে সে ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। তাই তাকে এটা বলে দেয়া জায়েয হবে যে, তুমি সতর্ক থেকো, তোমার বিরুদ্ধে অমুক এই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। এটাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। তিনি আমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়ে তারপর বিদায় নিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : একদিনের ঘটনা। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে দেখলাম, সামনের দিক থেকে এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তায় থাকাকালীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন : লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। আয়েশা (রা.) বলেন : একথা আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম। কারণ, দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তারপর লোকটি যখন মজলিসে এসে বসলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে স্বভাবানুযায়ী সদাচরণ করলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ভাষ্যমতে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। অথচ সে আপনার মজলিসে বসলো আর আপনি তার সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করলেন– এর কারণ কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন : দেখো, লোকটি আসলেই ভয়ঙ্কর। সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তার স্বভাব। মানুষ তার থেকে পালিয়ে বাঁচে। তার সাথে যদি সুন্দর ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি তার সাথে অভ্যাসমাফিক সুন্দর ব্যবহার করলাম। [তিরমিযী শরীফ : ১৯৯৬]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম লিখেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা.) কে যে বললেন, 'লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি।' সাধারণ দৃষ্টিতে এটা গীবত হয়েছে। যেহেতু মন্তব্যটি তার অনুপস্থিতিতে হয়েছে। তবুও এটা জায়েয। কারণ, এর দ্বারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো, লোকটির অনিষ্টতা থেকে আয়েশা (রা.)কে সতর্ক করা, যেন আয়েশা (রা.) লোকটির কোনো ফাসাদের শিকার না হন। সুতরাং হাদীসটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কাউকে অন্যের ষড়যন্ত্র বা অত্যাচার থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গীবত করা জায়িয। বরং এরূপ 'গীবত' গীবতভুক্ত নয়।

যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়

অবস্থাবিশেষে অপরের দোষ বর্ণনা করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন আপনি দেখলেন, একজন অন্যজনকে খুন বা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারবেন না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে

দিতে হবে, 'তোমার জীবন হুমকির সম্মুখীন'। এতে সে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করা আপনার জন্য বৈধ হবে।

প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত

এক হাদীস আছে, যার সঠিক অর্থ অনেকেই উদ্ধার করতে পারে না। হাদীসটি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا غِيْبَةَ لِفَاسِقٍ وَلَا مُجَاهِرٍ

অর্থাৎ– "ফাসিক এবং প্রকাশ্যে গুনাহকারী ব্যক্তির গীবত করলে তা গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে না।" [জামিউল উসূল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৫০]

হাদীসটির অর্থ অনেকে উল্টোভাবে করে। তাদের ধারণা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত অথবা বিদআতে অভ্যস্ত ব্যক্তির গীবত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করা যাবে। এতে কোনো গুনাহ নেই। এটা জায়েয। মূলত হাদীসটির অর্থ এটা নয়। বরং হাদীসটির মর্মার্থ হলো, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে। যেমন মদ্যপ। প্রকাশ্যে মদ পান তার জন্য নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। এ রকম ব্যক্তির পেছনে কেউ যদি বলে, 'অমুক মদ পান করে, তাহলে তা গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, এ ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদপান করেছে। প্রকারান্তরে এ ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে, আমি মদ পান করি। সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে কথাটি আলোচনা করলে মনোঃকষ্ট হওয়ার কথা নয়। বিধায় এটা গীবত হবে না।

এটাও গীবত

কিন্তু যেসব দোষ সে গোপন রাখতে চায়, সেসব দোষ নিয়ে যদি আপনি তার অনুপস্থিতিতে ঘাটাঘাটি করেন, তাহলে গীবত হবে। যেমন সে প্রকাশ্যে মদপান করে, প্রকাশ্যে সুদ খায়। কিন্তু একটা পাপ আছে, যা সে প্রকাশ্যে করে না। গোপনে করে। মানুষের নিকট তার এ পাপটি প্রকাশ করতে রাজি নয় সে। পাপ কাজটিও এমন যে, অন্যরা ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তার এই গোপন গুনাহর কথা আলোচনা করা তথা গীবত করা জায়েয হবে না। বোঝা গেলো, প্রকাশ্য গুনাহের আলোচনা গীবত নয়; বরং অপ্রকাশ্য গুনাহের আলোচনাগুলো গীবতের শামিল। উপরোক্ত হাদীসের মর্মার্থও এটা।

ফাসেক ও গুনাহগারের গীবতও নাজায়েয

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন : এক মজলিসে হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে

মজলিসের এক লোক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সমালোচনা শুরু করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাকে বাধা দিয়ে বললেন : দেখো, তোমার এ সমালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। তুমি মনে করো না, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যেহেতু শত শত লোকের হত্যাকারী, তাই তার গীবত হালাল হয়ে গেছে। ভালোভাবে জেনে নাও, তার গীবত করা হালাল হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে শত শত মানুষের রক্তের হিসাব যেমনিভাবে নেবেন, তেমনিভাবে তুমি যে তার পেছনে গীবত করেছো, তার হিসাবও নেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

সুতরাং ফাসিক, পাপী অথবা বিদআতী হলেই তার গীবত করা চলবে না। এ চিন্তা নিতান্তই ভ্রান্ত। এ জাতীয় লোকের গীবত করা থেকেও বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়

আরেকটি ক্ষেত্রে ইসলাম গীবতের অনুমতি দিয়েছে। তাহলো, কোনো ব্যক্তি তোমার উপর জুলুম করেছে। এ জুলুমের কথা তুমি অপরকে শোনাতে পারবে। বলতে পারবে, আমার সাথে এ অন্যায় করা হয়েছে, এ জুলুম করা হয়েছে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, গুনাহও হবে না। যাকে তুমি জুলুমের কাহিনী শুনিয়েছো, সে এর প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক– শোনাতে পারবে। যথা কোনো ব্যক্তি তোমার মাল চুরি করেছে। থানায় গিয়ে তুমি তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করলে, তাহলে যদিও এটা তার অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা হয়েছে কিন্তু এটা গীবত হবে না। কারণ, সে তোমার ক্ষতি করেছে, তারপর তুমি থানায় গিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়েছো। থানা কর্তৃপক্ষ এর বিচার করবেন। সুতরাং এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুরূপভাবে চুরির ঘটনা যদি এমন লোকের নিকট বলা হয়, যে এর প্রতিকার করতে সক্ষম নয়। যেমন চুরির খবর শুনে কিছু লোক তোমার বাড়িতে চলে আসলো, তুমি জানো যে, তোমার বাড়িতে চুরি কে করেছে। তাই তুমি তাদের নিকট বলে দিলে যে, আজ রাত অমুক আমার বাড়িতে চুরি করেছে। অথবা অমুক আমার এ ক্ষতি করেছে। কিংবা বললে, অমুক আমার উপর এ জুলুম করেছে। তাহলে এটা গুনাহ হবে না। যেহেতু এটা গীবত নয়।

লক্ষ্য করুন, ইসলাম মানব-প্রকৃতিকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হলো, দুর্দশাগ্রস্ত হলে সে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে চায়।

নিজের দুঃখের কথা অন্যকে বলে মনের বোঝা কিছুটা হালকা করতে চায়। তখন সে এই খেয়াল করে না যে, অপর কেউ তার দুঃখ লাঘব করতে পারবে কি-না! ইসলাম এই মানবীয় মেযাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। অন্যের নিকট দুঃখ ব্যক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

"আল্লাহ তাআলা মন্দ বিষয়কে প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। অবশ্য যার উপর জুলুম করা হয়েছে, তার কথা আলাদা। অর্থাৎ– তার উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেটা সে অপরের নিকট বলতে পারবে। এটা গীবত নয়, বরং জায়িয।"

মোটকথা উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় আল্লাহ তাআলা গীবতের আওতামুক্ত রেখেছেন। এগুলো গীবতের আওতাভুক্ত হবে না। এগুলো ব্যতীত আমরা যে মজলিসে বসলেই সমালোচনার ঝুলি খুলে দিই, সে সবই গীবত। সুতরাং গীবতের মহামারি থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের উপর দয়া করুন। যবানকে হেফাযত করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে যবান সংযত রাখার তাওফীক দিন। আমীন।

গীবত থেকে বাঁচার শপথ

গীবতের বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো, আপনারা এতক্ষণ তা শুনলেন। কিন্তু এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিলে চলবে না। প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, ইনশাআল্লাহ আর কোনো দিন কারো গীবত করবো না। পরনিন্দাসূচক একটি শব্দও বলবো না। তবুও কখনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নিতে হবে। গীবতের সঠিক প্রতিকার বা চিকিৎসা হলো, যার গীবত করা হয়েছে, তার নিকট সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করা। একথা বলা যে, ভাই, আমি তোমার গীবত করেছি, আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলার কিছু বিশেষ বান্দা আছেন, বাস্তবে তারা এমনই করেন।

বাঁচার উপায়

হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন : মাঝে-মধ্যে দু'-এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলে, 'হুযূর! আমি আপনার গীবত করেছি, আমাকে মাফ করে দিন।' আমি তাদেরকে বলি, 'এক শর্তে মাফ করবো। প্রথমে বলতে হবে আমার কী গীবত করেছো, যেন আমি জানতে পারি, মানুষ আমার সম্পর্কে কী বলে। যদি আমার সামনে বলতে পারো, মাফ পেয়ে যাবে।' থানবী (রহ.) বলেন : আমার এরূপ করার পিছনে একটা 'কারণ' আছে। তাহলো, হতে পারে, যে দোষ আলোচনা

করা হয়েছে, বাস্তবেই তা আমার মধ্যে আছে। সুতরাং দোষটি আমার জানা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা হয়ত তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দেবেন।

তাই গীবতের প্রকৃত চিকিৎসা এটাই। এ চিকিৎসা গ্রহণ করা যদিও কষ্টকর, যদিও মনের উপর করাত চালিয়ে তারপর অন্যকে বলতে হবে, 'আমাকে মাফ করে দাও, আমি তোমার গীবত করেছি।' তবুও এটাই আসল চিকিৎসা। দু'-চারবার এ তদবীরমতো কাজ করলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে। বুযুর্গানে দ্বীন অবশ্য গীবত থেকে বেঁচে থাকার অন্য ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। যেমন হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন : যখন অন্যের দোষচর্চার কথা মনে জাগবে, তখনই নিজের দোষগুলোর কথা চিন্তা করবে। ভাববে, কোনো মানুষই তো দোষমুক্ত নয়। আমার মধ্যেও তো এই দোষ আছে, ওই দোষ আছে...। সুতরাং অন্যের দোষচর্চা আমি কীভাবে করি। সাথে সাথে গীবতের শাস্তির কথাও ভাববে। আল্লাহর নিকট দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এ ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। মজলিসে দোষচর্চা হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করবে। দুআ করবে, হে আল্লাহ! এ মজলিসে গীবত শুরু হয়ে গেছে; আমাকে হেফাযত করুন। এ জঘন্য পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

গীবতের কাফফারা

এক হাদীসে এসেছে। (হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ।) যদি ঘটনাচক্রে কারো গীবত হয়েই যায়, তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য বেশি বেশি দুআ করা, ইসতিগফার করা। যেমন কেউ আজীবন গীবত করেছিলো। আজ তার হুঁশ হলো। ভাবলো, আমি তো আজীবন এ গুনাহ করে এসেছি। কার কার গীবত করেছি, তাও পুরোপুরি জানা নেই। কোথায় তাদেরকে খুঁজে বেড়াবো, তবে ভবিষ্যতে আর গীবত করবো না। এখন উপায়? উপায় একটাই। যাদের গীবত করা হয়েছে, তাদের জন্য দুআ করতে থাকা, ইসতিগফার অব্যাহত রাখা। এভাবে হয়ত গুনাহটি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

[মেশকাত শরীফ, কিতাবুল আদাব, হাদীস : ৪৮৭৭]

কারো হক নষ্ট হলে

কারো হক নষ্ট হলে– এ গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় কী? এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর চিঠি প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে লেখা ছিলো, "জীবনে আপনার বহু হক নষ্ট করেছি। কত অন্যায় আপনার সঙ্গে করেছি। সামগ্রিকভাবে আমার এ অসংখ্য অন্যায়-অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" এ জাতীয় চিঠি তাঁদের সম্পর্কের সকল লোকের নিকট পাঠিয়েছেন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। অন্যের হক নষ্ট করার গুনাহ থেকে মুক্তি দান করেছেন।

পক্ষান্তরে যদি এমন লোকের হক নষ্ট করা হয়, যার নিকট ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, হয়ত সে মারা গেছে অথবা এমন কোথাও চলে গেছে, যেখানের ঠিকানা জানা নেই এবং জানা সম্ভবও নয়। এরূপ অবস্থার নিরসনে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন : যার গীবত করেছো কিংবা হক মেরেছো, তার জন্য বেশি বেশি দুআ করতে থাকো। দুআ করো, হে আল্লাহ! আমি অমুকের গীবত করেছি, অমুকের হক নষ্ট করেছি– আপনি আমার উপর রহম করুন। আমার এ অন্যায় তাদের জন্য মর্যাদার 'কারণ'-এ পরিণত করুন।' সাথে সাথে তাদের জন্য অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। এটাও গুনাহ ও শাস্তি থেকে বাঁচার একটা পন্থা। আমরা যদি বুযুর্গদের মতো চিঠি লিখি, তাহলে আমাদের কি নাক কাটা যাবে? নাকি আমাদের মর্যাদাহানী হবে? হিম্মত করে যদি আমরা এরূপ করতে পারি, হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা কারো নিকট ক্ষমা চায় এবং অন্তর থেকেই চায়, যার নিকট ক্ষমা চাওয়া হয়, সে যদি ক্ষমাপ্রার্থীর করুণ ও লজ্জিত অবস্থা দেখে মাফ করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে ওই দিন মাফ করে দেবেন, যেদিন তাঁর ক্ষমা সবচে বেশি প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদি মাফ না করে বলে দেয়, 'আমি তোমাকে মাফ করবো না' তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন : আমিও সেদিন তোমাকে মাফ করবো না। তুমি যখন আমার বান্দাকে মাফ করছো না, আমি কীভাবে আজ তোমাকে মাফ করবো?

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্ষমা চাইতে হবে। মাফ করুক বা না করুক তবুও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমা চাওয়াও এক প্রকার দায়মুক্তি। যার হক নষ্ট করা হয়েছে, সর্বাবস্থায় তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে, এটা হক নষ্টকারীর অনিবার্য কর্তব্য।

মহানবী (সা.)-এর ক্ষমা চাওয়া

আমার আর আপনার মূল্যই বা কতটুকু? স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে

বললেন : আজ আমাকে তোমাদের নিকট সপে দিচ্ছি। যদি আমার দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাক, আমি যদি কারো শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি করে থাকি, তাহলে আজ আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিয়ে নাও। মাফ করতে চাইলে তাও করতে পার। কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যেন আমার যিম্মায় তোমাদের কোনো অধিকার অবশিষ্ট না থাকে।

এবার বলুন, সারা বিশ্বের রহমত, মানবজাতির মহান আদর্শ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহাবায়ে কেরাম যাঁর ইশারার অপেক্ষায় থাকতেন। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকতেন। আজ স্বয়ং তিনি বলছেন : যদি আমি কারো উপর কোনো অন্যায় করি, যদি কারো হক নষ্ট করি, তাহলে সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! একবার আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। আমি প্রতিশোধ নেবো।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটুও বিরক্ত হলেন না, বরং বললেন : 'এসো, প্রতিশোধ নাও। তুমিও আমার কোমরে আঘাত করো।' সাহাবী (রা.) এগিয়ে গেলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আঘাত করেছিলেন, আমার কোমর উন্মুক্ত ছিলো। কোমরে তখন কোনো কাপড় ছিলো না। তাই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে হলে আপনিও কাপড় উন্মুক্ত করুন।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন চাদরাবৃত। বললেন : 'আমি চাদর তুলে ধরছি।' এই বলে তিনি চাদর সরিয়ে নিলেন। সাহাবীও সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মহরে নবুওয়ত'কে চুমো দিলেন। তারপর বললেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি গোস্তাখী করেছি। শুধু এজন্য গোস্তাখী করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।' [মাজমাউয় যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এভাবে সাহাবায়ে কেরামের সামনে পেশ করলেন। ভেবে দেখুন, আমার আর আপনার স্থান কোথায়? তাই আমরা যদি নিজেদের সম্পর্কের লোকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার চিঠি লিখি, তাহলে আমাদের কী অসুবিধা হবে? হতে পারে, আল্লাহ এ উসিলায় আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে যখন আমরা কাজটি করবো, হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

ইসলামের একটি মূলনীতি

ইসলামের একটি মূলনীতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, 'ঈমানের দাবি হলো, নিজের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করবে, যা অন্যের জন্য পছন্দ কর। আর অপরের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য কর। অনুরূপভাবে নিজের জন্য তাই অপছন্দ করবে, যা অপরের বেলায় অপছন্দ কর।' এবার বলুন, আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ আপনার দোষ-ত্রুটি ঘাটাঘাটি করলে আপনার অন্তরে ব্যথা লাগবে কি? আপনি তাকে কী বলবেন– ভালো না খারাপ? যদি তাকে খারাপ ভাবেন, আপনার দোষচর্চার কারণে যদি সে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আপনি এই কাজটিই অন্যের জন্য করবেন– তা কীভাবে ভালো হতে পারে? এটা তো দ্বৈতনীতি। নিজের জন্য এক নিয়ম, অন্যের জন্য আরেক নিয়ম– এরই নাম মুনাফেকী। গীবতের মধ্যে মুনাফেকীও শামিল আছে। এ কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা করুন। গীবতের শাস্তির কথা ভাবুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ গীবত করার উৎসাহ কমে যাবে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার সহজ পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন : গীবত থেকে বেঁচে থাকার একটা সহজ পদ্ধতি আছে। তাহলো, অপরের আলোচনাই করবে না। ভালো-মন্দ– সকল আলোচনা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, শয়তান খুব ধূর্ত। যখন কারো প্রশংসা শুরু করবে এবং তার গুণ ও উত্তম অভ্যাসগুলো আলোচনা করবে, তখন শয়তান তোমার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। কোনো ফাঁকে তোমার মগজে ঢুকিয়ে দেবে যে, আমি তো শুধু প্রশংসাই করে যাচ্ছি। তার ওই দোষও তো আছে; সেটা বলি না কেন? তখন তোমার কথার ধরণ পাল্টে যাবে। বলবে, অমুক ভালো; কিন্তু এই দোষটি তার মধ্যে আছে। এভাবে 'কিন্তু' শব্দটিই তোমার সব শেষ করে দিবে। পুরো আলোচনাটা গীবতে পরিণত করে দেবে। তাই হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) বলেন : যথাসম্ভব অপরের আলোচনা থেকে বিরত থাকবে। ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্যেরই প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, একান্তই যদি করতে হয়, তাহলে ভালো আলোচনাই করার জন্য কোমর বেঁধে বসবে। সতর্ক থাকবে, শয়তান যেন ভুল পথে নিয়ে না যায়।

নিজের দোষ দেখো

ভাই! অন্যের দোষ কেন দেখ? নিজের দোষ দেখো। নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করো। কারণ, অপরের দোষের শাস্তি তোমাকে দেওয়া হবে না। তার

দোষের শাস্তি সে-ই ভোগ করবে। তুমি পাবে তোমার সাজা। এটাই তোমার ফিকির হওয়া চাই। নিজের আমলের ব্যাপারে সজাগ থাকা চাই। অপরের দোষ তখনই চোখে লাগে, যখন নিজ অন্যায় সম্পর্কে উদাসীন থাকে। নিজের দোষ-ত্রুটি যখন সামনে থাকে, তখন অন্যের দোষের দিকে ভুলেও চোখ যায় না। যবানে অন্যের দোষচর্চা আসে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজের দোষ দেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাজের সকল অনিষ্টের মূল একটাই- আমরা নিজেদের প্রতি নজর দিই না। ভুলে গেছি, আমার কবরে আমাকেই থাকতে হবে। আমাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা এসব কথা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছি। তাই কখনও এর গীবত করছি, কখনও ওর গীবত করছি। কখনও এর দোষচর্চা করছি, কখনও ওর দোষচর্চা করছি। মোটকথা, দিন-রাত আমরা এ জঘন্য গুনাহে লিপ্ত আছি। আল্লাহর ওয়াস্তে এ গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করুন।

আলোচনার মোড় পাল্টে দাও

আমাদের সমাজ ও পরিবেশ বড়ই নাজুক। এ সমাজে গীবত থেকে বেঁচে থাকা আসলেই কষ্টকর, তবে সাধ্যের বাইরে নয়। কারণ, সাধ্যের বাইরে হলে আল্লাহ তাআলা গীবত হারাম করতেন না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, গীবত থেকে বেঁচে থাকার শক্তি মানুষের আছে। সুতরাং আলোচনা যখন গীবতের পথে এগুবে, তখনই সেখান থেকে ফিরে আসবে। গীবত ছাড়া অন্য আলোচনা করবে। এরপরেও যদি গীবত হয়ে যায়, সাথে সাথে তাওবা করবে, ইসতিগফার করবে। ভবিষ্যতে গীবত না করার শপথ নেবে।

গীবত সকল অনিষ্টের মূল

মনে রাখবেন, গীবতই সকল অনিষ্টের মূল। ঝগড়া-ফ্যাসাদ এই গীবতের কারণেই হয়। পরস্পর অনৈক্যের মূলও এটি। বর্তমানে সমাজে যেসব বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য গীবতই অনেকাংশে দায়ী। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি মদপান করে, তাহলে সকলেই তাকে খারাপ ভাববে। দ্বীনের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিও তাকে মন্দ ভাববে। সকলেই বলবে, এ তো পাপাচারে লিপ্ত। স্বয়ং মদপানকারীও নিজেকে 'ভালো' মনে করবে না। অদৃশ্য এক পাপ-যাতনায় সে সর্বদাই লিপ্ত থাকবে। পক্ষান্তরে গীবতকারীর অন্তরে এরূপ কোনো অনুভূতি জাগে না। কেউ তাকে খারাপও মনে করে না। সুতরাং বোঝা

গেলো, গীবত যে কত বড় গুনাহ, তা আমাদের অন্তরে এখনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। জঘন্য, মারাত্মক ও অপবিত্র একটি কাজে আমরা লিপ্ত আছি- একথা আমরা আজও অনুধাবন করতে পারিনি। এর পরিণতির কথা আমরা একটুও ভাবি না। গীবতের হাকীকত সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ মদ পান করার গুনাহ আর গীবতের গুনাহর মধ্যে কোনোই তফাৎ নেই। মদপান করা যেমন অন্যায় ও অপরাধ, অনুরূপভাবে গীবত করাও একটা অপরাধ। সুতরাং অন্তরে গীবতের মারাত্মক পরিণতি ও জঘন্য শাস্তির ভয় সৃষ্টি করতে হবে।

ইশারার মাধ্যমে গীবত করা

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়া (রা.)-এর কথা উঠলো। সতীনদের মাঝে পারস্পরিক একটু টানাপড়েন থাকা যেহেতু অস্বাভাবিক নয় আর হযরত আয়েশা (রা.)ও এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তাই তিনি হযরত সুফিয়া (রা.)-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করলেন। এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রা.) ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে। মুখে বলেননি, কিন্তু ইশারায় বলেছেন। এরই প্রেক্ষিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন : 'হে আয়েশা! আজ তুমি এমন একটি অন্যায় করেছে, যার দুর্গন্ধযুক্ত বিষ কোনো সাগরে নিক্ষেপ করা হলে সমস্ত সাগর দুর্গন্ধ হয়ে যাবে।' ভেবে দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতমূলক গীবতের ভয়াবহতা কীভাবে তুলে ধরলেন! অতঃপর তিনি বলেছেন : কেউ যদি আমাকে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ দিয়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে কারো প্রতি বিদ্রূপ করে তার নকল করতে বলে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ওই ব্যক্তির বিদ্রূপ ও বদনাম ছড়ানো, তথাপি আমি কাজটি করতে প্রস্তুত নই। [তিরমিযী শরীফ, হাদীস : ২৬২৪]

গীবত সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

বিদ্রূপ করা এবং তার নকল করা আজকাল বিনোদনের একটা অংশে পরিণত হয়েছে। যে এ ব্যাপারে বেশি পারদর্শী- মানুষ তার প্রশংসা করে, তাকে ধন্যবাদ জানায়। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি সারা পৃথিবীর ধন-সম্পদও আমাকে দিয়ে দেয়, তবুও আমি কারো নকল করতে প্রস্তুত নই। এতে প্রতীয়মান হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে বাধা প্রদান করেছেন। জানি না, আমরা কেন

মদপান ও ব্যভিচারের মত গীবতকে খারাপ মনে করি না, ঘৃণাও করি না। বরং গীবত আমাদের নিকট মায়ের দুধেই মতই প্রিয়। আমাদের কোনো বৈঠক গীবতমুক্ত কাটে না। অথচ গীবত মদপান ও ব্যভিচারের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে এ জঘন্য গুনাহ পরিহার করুন।

গীবত থেকে বাঁচবো কীভাবে?

গীবত থেকে বাঁচার উপায় হলো, এর মারাত্মক পরিণতি এবং শাস্তির কথা হৃদয়ে বসাতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে কখনও গীবত করবো না। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে হবে, হে আল্লাহ! গীবত নামক জঘন্য গুনাহটি থেকে আমি পরিত্রাণ চাই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গল্প করার সময় গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ি, হে আল্লাহ! আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে কখনো গীবত করবো না। কিন্তু আমার এ শপথ ঠিক রাখা এবং এর উপর বদ্ধপরিকর থাকা তোমার সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! দয়া করে আমাকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সাহস, উৎসাহ ও তাওফীক দান করো। আজই সাহস করে এ শপথ ও দুআ করুন।

গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করুন

কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে তার উপর দৃঢ় সংকল্প করতে হয়। অন্যথায় কাজ পূর্ণ করা যায় না। কারণ, সকল নেক কাজের পথে শয়তান বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সে কাজকে পেছনে নিয়ে যেতে থাকে। সাথে সাথে প্ররোচণাও দিতে থাকে যে, ঠিক আছে, কাজটি আগামী দিন থেকে শুরু করা যাবে। কথিত 'আগামী দিন' এলে দেখা যায়, নতুন আরেকটি ওজর সামনে এসে দাঁড়ায়। কাজ আর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন মনে মনে বলে, ঠিক আছে, আগামী দিনই শুরু করা যাক। এভাবে আগামী দিন শুধু 'আগামী দিন'ই থেকে যায়। 'আগামী' আর 'বর্তমান' হয় না। তাই কাজ করতে হলে সাথে সাথেই করতে হবে।

জাগতিক কর্মেও আমরা দেখি, যার আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি- সে আয় বাড়ানোর কেমন হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে। ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করার জন্য কত কষ্ট করে! অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভের জন্য কতই না প্রচেষ্টা চালায়। অথচ আমাদের কী হলো? আমরা আমাদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি না এবং এর জন্য চিন্তিতও হই না। স্বীয় অন্তরে অনুশোচনা জাগিয়ে তুলুন। ব্যাকুল-অনুতপ্ত হয়ে দু' রাকাত সালাতুল হাজাত পড়ুন। অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করুন যে, 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ পরিহার করতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

আমাকে দৃঢ়তা দান করুন।' দুআর পর বদ্ধপরিকর হবে এবং প্রতিজ্ঞাপালনে নিজেকে বাধ্য রাখবে।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন : তবুও যদি কাজ না হয়, তাহলে নিজের উপর কিছু জরিমানা নির্দিষ্ট করে নাও। যথা- এভাবে প্রতিজ্ঞা করবে যে, কোনো সময় গীবত হয়ে গেলে দু'রাকাত নফল নামায পড়বো অথবা আল্লাহর রাস্তায় এত টাকা দান করবো। এভাবে আমল করলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে গুনাহটি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাও থাকতে হবে। কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য যেরূপ ব্যাকুল থাকে, ঠিক তদ্রূপ ব্যাকুল থাকতে হবে। কারণ, এ বদস্বভাব মারাত্মক একটি ব্যাধি। শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক ব্যাধি এটি। এ ব্যাধি মানুষকে দোযখের অতলান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তাই গুনাহটি ছাড়তেই হবে। পরিবারকেও রক্ষা করতে হবে এ জঘন্য গুনাহ থেকে। নারীদের মধ্যে গুনাহটির প্রচলন বেশি। দু'-চারজন নারী একত্র হলেই শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। এ জন্য নারীরা সর্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। তাহলে সংসার ও পরিবার গুনাহটি থেকে সহজে বাঁচতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

চোগলখুরি একটি জঘন্য গুনাহ

আরেকটি গুনাহের নাম চোগলখুরি। এটি গীবত থেকেও জঘন্য গুনাহ। আরবী ভাষায় এর নাম 'নামীমাহ' (نميمة)। অনুবাদ করলে এর নাম হয়- চোগলখুরি। মর্মার্থ হলো, অপরের দোষ এজন্য বর্ণনা করা, যেন শ্রোতা তার ক্ষতি করে। ক্ষতি যদি হয়েই যায়, তাহলে বর্ণনাকারী বেশ খুশি হয়- বেশ ভালো হয়েছে, তার কষ্ট হয়েছে। বর্ণনাকৃত দোষটি বাস্তবেই ওই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাক বা না যাক- শ্রবণকারী যেন কষ্ট দেয় এটাই উদ্দেশ্য। এরই নাম 'নামীমাহ'।

গীবতের চেয়েও বড় গুনাহ

কুরআন ও হাদীসে চোগলখুরির অনেক নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, গীবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না, যার দোষচর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকে না। পক্ষান্তরে চোগলখুরির মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষচর্চা করা হচ্ছে, তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। সুতরাং এটি দুটি গুনাহের সমষ্টি। একটি হলো গীবত। দ্বিতীয়টি হলো

মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার নিয়ত। তাই কুরআন-হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরবাণী এসেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

(কাফিরদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) ওই ব্যক্তির মত চলে, যে অন্যকে তিরস্কার করে, খোঁটা দেয় এবং একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায়।

হাদীস শরীফে এসেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' [বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব]

কবরের আযাবের দু'টি কারণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তার পাশে দু'টি কবর দেখতে পেলেন। কবর দু'টির কাছে পৌঁছে তিনি সে দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : এ দুই কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। (আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযাব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে, কবরের আযাব চলাকালে তার ভয়ংকর আওয়াজ আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের থেকে গোপন রাখেন। কারণ, ওই আযাব যদি মানুষ শুনতো, তাহলে কেউ জীবিত থাকতে পারতো না। দুনিয়ার সবকিছু থেমে যেতো। এজন্য আল্লাহ তাআলা এ আওয়াজ গোপন রেখেছেন। অবশ্য কোনো কোনো সময় মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করে থাকেন।) অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা জানো কি এ আযাব কেন হচ্ছে? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন : দুটি কারণে এদের উপর আযাব হচ্ছে। একজন পেশাবের ছিটা থেকে নিজের কাপড় এবং শরীরকে বাঁচাতো না। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় মানুষ উট-ছাগল চরানোর অভ্যাস ছিলো। তারা উট-ছাগলের পাশে থাকতো। অনেক সময় ওদের পেশাবের ছিটা থেকে শরীর ও কাপড় রক্ষা করা যেতো না। তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা ও সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে আযাব হচ্ছে। কারণ, ইচ্ছে করলে এবং সতর্ক থাকলে এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন কিছু ছিলো না। যেমন নরম স্থানে পেশাব করলে পেশাবের ছিটা থেকে সহজেই বাঁচা যায়।

[মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৯]

পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা

আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্রতার শিষ্টাচার ইসলামে সবিস্তারে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার অশুভ দাপটে মানুষ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো মোটামুটি শিখে; কিন্তু শরয়ী পবিত্রতার কিছুই শিখে না। বাথরুম এমনভাবে বানানো হয়, ইচ্ছে করলেও পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা মুশকিল হয়ে যায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

'পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে।' পেশাবের ছিটা শরীর বা কাপড়ে লেগে গেলে কবরের আযাব হয়। সুতরাং এ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

চোগলখুরি থেকে বেঁচে থাকা

হাদীসে বর্ণিত অপর ব্যক্তির আযাব হচ্ছিলো– যেহেতু সে অন্যের চোগলখুরি করে বেড়াতো। বোঝা গেলো, চোগলখুরির কারণে আযাব হয়। চোগলখুরি তো গীবতের চেয়েও জঘন্য। যেহেতু এর মধ্যে অপর মুসলমানের ক্ষতি করারও নিয়ত থাকে।

গোপন কথা প্রকাশ করা

ইমাম গাযযালী (রহ.) এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন : কারো গোপন কথা বা তথ্য ফাঁস করে দেয়াও চোগলখুরির অন্তর্ভুক্ত। যেমন কারো এমন কিছু কথা আছে অথবা এমন কোনো বিষয় আছে, ভালো কিংবা মন্দ– যার সে প্রকাশ চায় না। যেমন– একজনের ধন-সম্পদ আছে। মানুষ জেনে ফেলুক– এটা সে চায় না। অথচ আপনি বলে বেড়ালেন, 'অমুকের এই এই সম্পদ আছে।' তাহলে এটাও চোগলখুরি, যেটা সম্পূর্ণ হারাম। অথবা কেউ কোনো পারিবারিক পরিকল্পনা করেছে। তুমি কোনোভাবে সেটা জেনে ফেলেছো। আর তা বলে বেড়াচ্ছো, তাহলো এটা চোগলখুরির শামিল। অনুরূপভাবে কারো গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়াও চোগলখুরির অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এসেছে :

اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

অর্থাৎ 'মজলিসের কথাবার্তা আমানত।'

যেমন কেউ আপনাকে বিশ্বস্ত ভেবে মজলিসে আপনার সামনে আলোচনা করলো, তাহলে এটা আমানত। আপনি যদি অন্যের কাছে বলে দেন, তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে এবং এটাও চোগলখুরি হবে।

যবানের দুটি মারাত্মক গুনাহ

মোটকথা আমরা এখানে 'যবান' দ্বারা সংঘটিত দুটি গুনাহর কথা আলোচনা করলাম। গুনাহগুলোর ভয়াবহতা আপনারা হাদীসের আলোকে জানতে পেরেছেন। এসব গুনাহ যে পরিমাণের জঘন্য, আমরা সে পরিমাণের উদাসীন। আমাদের মজলিস, ঘর-বাড়ি এসব গুনাহে পরিপূর্ণ। আমাদের যবান লাগামহীনভাবে চলেছে তো চলেছেই। থামার কোনো নাম নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে মুখে লাগাম লাগান। নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানমাফিক তাকে পরিচালিত করুন। এর কারণে আজ পরিবারের পর পরিবার বিরান হয়ে যাচ্ছে।

পরস্পর মতানৈক্য, ফেতনা-ফাসাদ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে। কি আপন কি পর– সকলেই পরস্পরের দুশমনে পরিণত হচ্ছে। আর দুনিয়ার এসব ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও আখেরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি তো আছেই। আল্লাহই জানেন, দুনিয়াতে এর কারণে কত ফিতনা জন্ম নিচ্ছে।

আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন। এর ভয়াবহতা ও কদর্যতা উপলব্ধি করার তাওফীক দিন। বাঁচার উপায়সমূহের উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

‘এসব আদব ও মুস্তাহাব কাজ আমাদেরকে শিখিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এগুলো ফরয নয়, ওয়াজিবও নয়। কিন্তু এগুলোর নূর ও বরকত অনেক। এগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের ভালোবাসার দাবি। তাই এগুলো পালন কিংবা বর্জনের এখতিয়ার আছে। এটাও নবীজিরই করুণা যে, তিনি আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : না করলে গুনাহ নেই, করলে সওয়াব আছে। উদ্দেশ্য এসব শিষ্টাচারে আমাদের অভ্যস্ত করানো।’

ঘুমানোর আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ঘুমানোর পূর্বে লম্বা দুআ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ - اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ

(صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كِتَابُ الدَّعْوَاتِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا نَامَ)

হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর সময়ের দুআ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ঘুমানোর তরীকা বলে দিয়েছেন। যখন শোয়ার উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে, তখন কীভাবে শোবে? কীভাবে ঘুমাবে? উম্মতের প্রতি নবীজির দরদ ও শফকত দেখুন, উম্মতের প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষা তিনি কত চমৎকারভাবে দিয়েছেন। মমতাময়ী মা ও দরদী পিতা নিজ সন্তানকে যেভাবে শেখান, উম্মতকে তিনি ঠিক সেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। পঠিত হাদীসের বর্ণনাকারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—

قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّاْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ "وَذَكَرَ نَحْوَهٗ"

(المرجع السابق)

শোয়ার পূর্বে অযু করে নেবে

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, শয্যাগামী হওয়ার পূর্বে তুমি নামাযের অযুর মতো অযু করে নেবে। এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। পালন না করলে গুনাহগার হবে না। কারণ, শোয়ার পূর্বে অযু করা ফরয নয়, ওয়াজিবও নয়। তবে নবীজির শিক্ষা তো অবশ্যই। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নেবে।

মহব্বতের আদব ও তার দাবি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুস্তাহাব কাজগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এসব কাজ যদিও ফরয-ওয়াজিব নয়; কিন্তু এগুলোর নূর ও বরকত অপরিসীম। আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দাবি হলো, বান্দা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব আদায় করবে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দাবি হলো, উম্মত তাঁর সুন্নাত ও মুস্তাহাব আদায় করবে। তিনি উম্মতকে আদব শিখিয়েছেন, উম্মত সেসব আদব যত্নসহ লালন করবে এবং যথাসম্ভব সেগুলো নিজের জীবনে পালন করবে। আল্লাহর দয়া যে, তিনি এগুলো আমাদের উপর ফরয-ওয়াজিব হিসাবে চাপিয়ে দেননি। হ্যাঁ, এগুলোর প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। উদ্দেশ্য, উম্মত যেন এগুলো গুরুত্বসহ আদায় করে। উম্মত যেন নবীজির শিক্ষায় নিজেকে ধন্য করে।

ডান কাত হয়ে শোবে

শোয়ার পূর্বে অযু করা একটি আদব। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনেক, মানুষ যার কল্পনাও করতে পারে না। শোয়ার এ আদবটির মধ্যেও না জানি কত হেকমত লুকিয়ে আছে। শোয়ার দ্বিতীয় আদব হলো, প্রথমে ডানে কাত হয়ে শোয়া। পরে ইচ্ছা করলে পাশ পরিবর্তন করা যাবে। এটা আদবপরিপন্থী হবে না। প্রথমে ডান দিকে ফিরে শয়ন করবে। তারপর এ দুআটি পাঠ করবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে, হৃদয়কে আল্লাহমুখী করবে। দুআটি এই—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

দ্বীনের বিষয়-আশয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআটিতে অত্যন্ত কোমল শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি শব্দ মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে। তিনি বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার অধীন করেছি। অন্য ভাষায়, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারাকে আপনার অভিমুখী করেছি। হে আল্লাহ! আমার সমূহ বিষয় আপনার কাছে অর্পণ করেছি অর্থাৎ— সারা দিন তো দৌড়ঝাপের মাঝে কাটিয়েছি। রিযিকের অন্বেষায়, চাকরির তালাশে, ব্যবসার কাজে, আবিষ্কারের ধান্ধায় এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় আমার দিনটা কেটে গেছে। সকল কর্ম-ধান্ধা শেষে ঘরে ফিরে এলাম। আমাকে এখন আরাম করতে হবে, ঘুমোতে হবে। মানুষের স্বভাব হলো, রাতের বেলায় বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দিনের সকল চিন্তা-ভাবনা মাথায় এসে ভিড় করে, যাবতীয় চিন্তা ও শঙ্কার কারণে উৎকণ্ঠিত হয়। ভাবে, অমুক কাজ অর্ধেক বাকি— না জানি তার কী অবস্থা? দোকান রেখে এসেছি, না জানি তার কী হলো? রাতে চুরি হয়ে যাবে না তো? আল্লাহ জানেন অমুক জিনিস কেমন হলো?— এ জাতীয় নানা চিন্তায় মানুষ শঙ্কিত হয়, মন পেরেশান থাকে। তাই শোয়ার সময় দুআ করে নাও যে, হে আল্লাহ! দিনের বেলায় যতদূর সম্ভব কাজ করেছি। আর রাতের বেলায় আপনার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি। আমি এখন অক্ষম। আপনার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আপনি ছাড়া অন্য কোনো সহায় নেই। হে আল্লাহ! আমার অপূর্ণ কাজগুলো পূর্ণ করে দিন।

অর্পণ : শান্তি ও স্থিরতার কারণ

একে বলা হয় নিজেকে অর্পণ করা। এর অপর নাম তাওয়াক্কুল। নিজের দায়িত্ব আদায় করে, সামর্থানুযায়ী নিজের কর্ম সম্পাদন করে তারপর 'আল্লাহর হাওয়ালা' বলা। আলোচ্য দুআটিতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শিক্ষা দিয়েছেন। ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছো তো দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে দূরে সরিয়ে দাও। সব কাজ আল্লাহর হাওয়ালা করো।

سپردم بتو مایہ خویش را

تو دانی حساب کم و بیش را

নিজেকে আল্লাহর কাছে অর্পণের প্রকৃত মজা ও অবস্থা তখনই অনুধাবন করতে পারবে, যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করে দিতে পারবে। শান্তি,

আত্মতৃপ্তি ও স্থিরতার পথ একটাই। তাহলো, নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। প্রতিটি কর্মতৎপরতার একটা নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। যে সীমানা অতিক্রম করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত চেষ্টা চালাতে পারে। এরপর আর পারে না। সেই নির্দিষ্ট সীমানাতে গিয়ে অবশিষ্ট কাজ আল্লাহর সোপর্দ করে দেয়াই একজন মুমিনের কাজ। একজন মুসলিম এবং একজন কাফেরের মধ্যে মূল পার্থক্য এখানেই। কাফের কাজের পেছনে চেষ্টা চালায়, তদবির করে, মেহনত করে। আর এর উপরই ভরসা রাখে। নিজের চেষ্টা-তদবিরকেই সবকিছু মনে করে। ফলে সব সময় শঙ্কিত থাকে, চিন্তাযুক্ত থাকে। অজানা ভয় তাকে তাড়া করে ফিরে। অন্য দিকে যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়, তাঁর উপরই শুধু ভরসা রাখে, সে ব্যক্তি আল্লাহকে বলে : হে আল্লাহ! আমার এতটুকু সাধ্য ছিলো। সাধ্যমতো আমার কাজ আমি করেছি। অবশিষ্টটা আপনার নিকট সোপর্দ করেছি। আপনি যে ফায়সালা করবেন, সেটার উপরই আমি খুশি আছি। মনে রাখবে, এ নেয়ামত আল্লাহ সকলকে দান করেন না। চিন্তা জগতের এ বিশেষ গুণ আল্লাহ সকলের মাঝে সৃষ্টি করেন না। যাকে দান করেন, তাকে অসহনীয় পেরেশানী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যাহোক, ঘুমানোর সময় নিজেকে 'আল্লাহর হাওয়ালা' করবে। এর জন্য দুআ করবে।

আশ্রয়স্থল একটাই

তারপর বলা হয়েছে–

وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ

অর্থাৎ– আর আমি আশ্রয়স্থল হিসাবে আপনাকেই গ্রহণ করেছি। আপনার নিরাপত্তায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। গোটা দুনিয়ার আসবাব ও মাধ্যমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনার আশ্রয়স্থলে পৌছেছি। আপনার নিরাপত্তা ব্যতীত আমার কোনো উপায় নেই। এখন আমি আপনার প্রতি আগ্রহী, আপনার রহমতের প্রত্যাশী। রহমতের দৃষ্টিতে বান্দাকে দেখবেন, এ আশাবাদ ব্যক্ত করি। সাথে সাথে আপনাকে ভয়ও করি। কারণ, আমার শরীরে, নিঃশ্বাসে, বিশ্বাসে অগণিত গুনাহের নিদর্শন আছে। না জানি, এগুলোর জন্য গ্রেফতার হয়ে পড়ি। –এরূপ ভয় এবং আশার দোল খেতে খেতে ঘুমানোর ইচ্ছা করেছি।

এরপর আরো চমৎকারভাবে উচ্চারিত হয়েছে–

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

অর্থাৎ– আপনার দরবার থেকে ছুটে অন্য আর কোথায় যাবো। কারণ, আপনার দরবার ছাড়া যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। যদি আপনি গোস্বা হন, যদি আপনার আযাব-গযব এসে পড়ে, তাহলে পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবো। আশ্রয়স্থল তো আর নেই। পালালেও আপনার কাছেই পালাতে হবে। হে আল্লাহ! বান্দাকে আপনার আযাব ও গযব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

তীরন্দাজের পাশে বসে যাও

একবার এক বুযুর্গ বলেছেন : মনে করো, কোনো মহাশক্তির হাতে রয়েছে কামান। গোটা আসমান হলো কামানের ধনুক। আর যমীন হলো ধনুকের ছিলা। বিপদাপদ, দুর্যোগ ও বিভিন্ন মসিবত হলো কামান থেকে নিক্ষেপিত তীর। এবার বলুন, এসব ভয়ানক তীরের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার পথ কী? কীভাবে এগুলো থেকে রক্ষা পাবে? কোথায় পালাবে?

তারপর বুযুর্গ বলেন : এসব অগণিত তীরের আক্রমণ থেকে বাঁচার একটাই পথ। তাহলো, সোজা চলে যাবে তীর যে চালায় তার পাশে। পাশ ঘেঁষে বসে থাকবে। তাহলেই রক্ষা পাবে। এটাই لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ এর মর্মার্থ।

অবুঝ শিশু থেকে শিক্ষা নাও

আমার এক বড় ভাইয়ের এক নাতি আছে। একদিন তিনি দেখলেন, তার মা কেন যেন তাকে মারছে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মা যত মারধর করছে, শিশুটি মাকে ততই জড়িয়ে ধরছে। সে পালাবার পরিবর্তে মায়ের কোলে ঢুকে যাচ্ছে। শিশুটি কেন এমন করছে? কারণ, সে জানে, মায়ের মারধর থেকে রক্ষা পাওয়ার পথও এই মায়ের কাছেই। মায়ের কাছে পাবে সে প্রকৃত নিরাপত্তা। মায়ের কোল ছাড়া অন্য কোথাও সে শান্তি ও স্থিরতা পাবে না। বোঝা গেলো, এ অবুঝ শিশুরও জানা আছে, প্রকৃত নিরাপত্তা কোথায় আছে। সেও জানে, তার প্রকৃত আশ্রয়স্থল মায়ের কাছেই আছে।

এ ধরনের বুঝ ও অনুভূতিই আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মসিবত আসে, তাহলে তার থেকে বাঁচার পথও তাঁরই কাছে। মসিবত থেকে উদ্ধার তিনিই করতে পারেন। তাই মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা তাঁরই নিকট করতে হবে। দুআ করতে হবে, আল্লাহ যেন মসিবত থেকে উদ্ধার করেন,

যেন তকলীফ দূর করে দেন। তিনি যেন আযাব থেকে রক্ষা করেন। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাঁর পথ ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই।

সোজা জান্নাতে চলে যাবে

অতঃপর বলা হয়েছে–

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

অর্থাৎ– "আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি। আরও ঈমান এনেছি আপনার প্রেরিত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

উপরি-উক্ত কথাগুলো ঘুমানোর পূর্বে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘুমানোর পূর্বে এটাই হবে তোমার শেষ কথা। এরপর কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়বে।

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : রাতের বেলা ঘুমানোর পূর্বে কয়েকটি কাজ করে নেবে। প্রথমে দিনের গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে নেবে। বরং অতীতের সকল গুনাহ থেকেই তাওবা করবে, অযু করে নেবে। তারপর উক্ত দুআটি পড়ে নেবে। এ দুআর মাধ্যমে তোমার ঈমান তাজা হবে। শোয়ার সময় ডান পাশ হয়ে শোবে। এসব কাজ করলে তোমার ঘুমও ইবাদত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মারা গেলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতী হবে। আল্লাহ চাহেন তো সোজা জান্নাতে চলে যাবে। জান্নাতে যাবার পথে কোনো বাধা থাকবে না।

শোয়ার সময়ের সংক্ষিপ্ত দুআ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهٖ، ثُمَّ يَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا" وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ الدَّعْوَاتِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا نَامَ)

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যাগামী হতেন, তখন নিজের গালের নিচে হাত রেখে শুতেন আর এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

'হে আল্লাহ! আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হবো।'

ঘুম একটি ক্ষুদ্র মওত

এ হাদীসটির তুলনায় পূর্বের হাদীসটির দুআ আরেকটু বড় ও ব্যাপক। এ উভয় দুআ নিদ্রার পূর্বের দুআ। উভয়টিই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কখনও এটি পড়বে, কখনও ওটি পড়বে। ইচ্ছা করলে উভয়টিই এক সাথে পড়ে নেয়া ভালো। দ্বিতীয় দুআটি তো একেবারে ছোট, যা মুখস্থ রাখাও খুব সহজ। এই ছোট্ট দুআটিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, নিদ্রা একটা ছোট মৃত্যু। কারণ, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে বেখবর হয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির মতো ঘুমন্ত ব্যক্তিও দুনিয়া সম্পর্কে খবর রাখে না। তাই ঘুম নামক ছোট মওতের মাধ্যমে আসল মওতের কল্পনা করবে। এ ছোট মওতটি তো তোমার নিত্য দিনের অতিথি। এভাবে একদিন আসল মৃত্যুই চলে আসবে, যে মৃত্যু থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, যে মৃত্যু থেকে প্রতিদিনের মত জাগ্রত হতে পারবে না। কিয়ামতের পূর্বে যে মৃত্যু থেকে জেগে উঠবে না। সুতরাং ছোট মৃত্যুর মাধ্যমে বড় মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন। এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতিদিনের ঘুমের পূর্বে দুআ করুন যে, হে আল্লাহ! আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি আর আপনার নামে পুনরায় জীবিত হবো।

জাগ্রত হয়ে যে দুআ পড়বে

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগতেন, তখন এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আপনার শোকর আদায় করছি। মৃত্যুর পর আপনি নতুন জীবন দান করেছেন। অবশেষে একদিন আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আজ যে মৃত্যু থেকে উঠেছি, তা তো একটা ক্ষুদ্র মৃত্যু। এ ক্ষুদ্র মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে নবজীবন লাভ করেছি। অবশেষে একদিন এমন মৃত্যু আসবে, যেখান থেকে আর ফিরে আসা যাবে না। সেদিন যেতে হবে আপনারই কাছে।

মৃত্যুর স্মরণ কর বারবার

প্রতিটি কদমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দু'টি শিক্ষা দিয়েছেন। একটি হলো– تَعَلُّقْ مَعَ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। দ্বিতীয়টি হলো– رُجُوْعْ اِلَى اللّٰهِ তথা তোমাকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ– প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহকে স্মরণ করো। যিকিরে মশগুল থাকো।

কারণ, তোমার জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে। তোমাকে তাঁর কাছে যেতেই হবে। সুতরাং যখন ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তখন উপরিউক্ত দুআটি করবে, তাহলে অন্তরে মওতের কথা স্মরণ হবে। আখেরাতের কথা মনে পড়বে। কতদিন আখেরাতের ধ্যানমুক্ত থাকবে? আর কতদিন উদাসীন থাকবে? উক্ত দুআটি প্রতিদিন পড়বে, তাহলে একদিন না একদিন আখেরাতের কথা স্মরণ হবেই। দুআটি আখেরাতের স্মরণ সৃষ্টি করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ (جَامِعُ التِّرْمِذِي، صِفَةُ الْقِيَامَةِ، الرقم : ٢٤٦٠)

অর্থাৎ– 'সকল আরাম-আয়েশ ছিন্নকারী মওতকে বেশি বেশি স্মরণ করো।'

কারণ, মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথাও স্মরণ হবে। আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি মনে জাগবে। আমাদের জীবনের সকল অনিষ্টের মূল হলো গাফলত। মওত সম্পর্কে আমরা গাফেল। জবাবদিহিতার অনুভূতি আমাদের মাঝে নেই। এ উদাসীনতা দূর করতে আমরা সফল হতে পারবো। আল্লাহর সামনে উপস্থিতির চিন্তা মনের মাঝে আনতে পারলে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা চিন্তা-ভাবনা করবো। তখন চিন্তা থাকবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি। এইজন্য এসব মাসনুন দুআ নিজেরা মুখস্থ করে নেয়া উচিত এবং শিশুদেরকেও এগুলো শেখানো উচিত।

উপুড় হয়ে শোয়া উচিত নয়

عَنْ يَعِيْشِ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ اَبِىْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى بَطْنِىْ، اِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِىْ بِرِجْلِهٖ، فَقَالَ : اِنَّ هٰذِهٖ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَبُوْ دَاوُد، كِتَابُ الْاَدَبِ، باب فى الرجل ينبطح على بطنه، الرقم ٥٠٤٠)

হযরত য়াইশ ইবনে তাহফা গিফারী (রা.) বলেছেন : আমার পিতা আমাকে একটা ঘটনা শুনিয়েছে যে, একদিন আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। ইত্যোমধ্যে অনুভব করলাম, কে একজন তার পা দিয়ে আমাকে নাড়াচ্ছে আর বলছে : এটা শোয়ার সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। যখন আমি মুখ ঘুরিয়ে লোকটি দেখলাম, দেখতে পেলাম যে, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বোঝা গেলো, এ পদ্ধতিতে শোয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয় বিধায় তিনি সাহাবীকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন। সুতরাং

প্রতীয়মান হলো, বিনা প্রয়োজনে উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ। এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে অস্বস্তিজনক।

যে মজলিস আফসোসের কারণ হবে

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ

(ابو داؤد، كتاب الادب، باب كراهية ان يقوم الرجل الخ : ٤٨٥٦)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কোনো মজলিসে বসলো, যেখানে আল্লাহর কথা বলা হয়নি, আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সে মজলিস আখেরাতে তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অর্থাৎ– আখেরাতে সে আফসোস করে বলবে, আহ, যদি এমন মজলিসে অংশগ্রহণ না করতাম! আল্লাহর স্মরণমুক্ত মজলিসে যদি শরিক না হতাম! আফসোস এজন্য করবে, যেহেতু মুসলমানের কোনো মজলিসই তো আল্লাহর স্মরণমুক্ত হতে পারে না।

আমাদের মজলিসসমূহের অবস্থা

একটু ভাবা দরকার, নিজেদেরকে যাঁচাই করা দরকার, নিজেদের আঁচলে উঁকি দিয়ে দেখা দরকার যে, আমাদের কতটি মজলিস, কতটি মাহফিল এবং কতটি সভা-সেমিনারে আজ আল্লাহর নাম নেয়া হচ্ছে, আল্লাহর কথা বলা হচ্ছে, দ্বীনের কোনো আলোচনা হচ্ছে। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় এমন মজলিস একদিন আমাদের আফসোসের কারণ হবে।

বর্তমানে সভা-সেমিনারকে দৃষ্টিনন্দন করার হিড়িক চলছে। নিয়মিত অযথা গল্প-গুজবের আসর বসানো হচ্ছে। চা-চক্রের আড্ডা জমানো হচ্ছে। এসব মজলিসের উদ্দেশ্য থাকে কেবলই 'গল্প-গুজব এবং আড্ডা' এগুলোতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না। আল্লাহর দ্বীনের কথা বলা হয় না। চলে শুধু আড্ডাবাজি, গলাবাজি আর সময় নষ্ট করার বিচিত্রময় কারসাজি।

ফলে এসব মজলিসে আমদানী হয় গীবতের ঝুলি, মিথ্যার বুলি, অপরের মনে কষ্ট দেয়ার রং-বেরঙের চুটকি, অন্যকে খাটো করার, আরেকজনকে নিয়ে মজা করার বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী। এসব ফালতু কর্মসূচি এসব মজলিসে হচ্ছে। কারণ, আয়োজকগণ আল্লাহর দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে গেছে। গাফলতের অনিবার্য পরিণতিতে এসব মজলিস পরিণত হয়েছে গুনাহর কেন্দ্রবিন্দুতে।

একথাটিই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষায় এভাবে বলেছেন যে, যে মজলিসে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, সে মজলিস কিয়ামত দিবসে আফসোসের কারণ হবে, হায় হায় করবে। বলবে, আহ! কত সময় নষ্ট করেছি। যেহেতু আখেরাত মানেই তো হিসাব-কিতাবের দিন। আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার দিন। সেদিন সময়ের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব হবে। প্রতিটি নেকীর মূল্য থাকবে। একেকটি নেকী সেদিন মানুষের জন্য সীমাহীন তামান্নার বস্তু হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া তো মাতা-পিতার মমতার চেয়েও বেশি। তিনি উম্মতকে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আফসোসের সেই দিনটি আসার পূর্বে সতর্ক হয়ে যাও। এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করো।

খোশগল্প জায়েয

এ সুবাদে একটা কথা বলে দিচ্ছি, উপরিউক্ত আলোচনার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ মুখ গোমরা করে রসহীন হয়ে বসে থাকবে। কারো সাথে মিশবে না, খোশগল্প করবে না। এটা মোটেও উদ্দেশ্য নয়। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও সাহাবায়ে কেরামের সাথে খোশগল্প করতেন, তাঁদের সাথে বসতেন। এমনকি তিনি বলেছেন–

رُوْحُوْا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً (كنز العمال، رقم الحديث : ٥٣٥٤)

'মাঝে মাঝে হৃদয়কে আরাম দাও।'

সুতরাং মাঝে মধ্যে খোশগল্প করা, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করাতে কোনো সমস্যা নেই। সাহাবায়ে কেরাম তো এও বলেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসা থাকতেন আর আমরা কখনও কখনও জাহিলিয়াত যুগের ঘটনাও বলতাম। জাহিলিয়াত যুগের, কার্যবিবরণী শোনাতাম, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতেন ও মুচকি হাসতেন। কিন্তু আমাদের মজলিস ছিলো অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানে গুনাহ সংঘটিত হতো না, অপরের গীবত হতো না। অন্যের মনে কষ্ট যাবে, এমন আলোচনা চলতো না। তাছাড়া আমাদের অন্তর থাকতো আল্লাহমুখী, আল্লাহর স্মরণ হতো ভুরি ভুরি। যেমন আইয়ামে জাহিলিয়াতের আলোচনা হতো। সাথে সাথে আল্লাহর শোকরও আদায় করা হতো। তিনি আমাদেরকে জাহিলিয়াতপূর্ণ সমাজ থেকে উদ্ধার করেছেন। মুক্তির সোনালী পথ দেখিয়েছেন, তাই তাঁর লাখো-কোটি শোকর। এমনই ছিলো আমাদের আসর। বাস্তবেই তাঁরা ছিলেন নিম্নোক্ত উক্তির বাস্তব উদাহরণ–

دست بکار، دل بیار

অর্থাৎ– হাত আপন কাজে ব্যস্ত, যবান নিজের কাজে মত্ত আর হৃদয় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত।

শান যাঁর অক্ষুন্ন

বলা তো সহজ কিন্তু আমল করা কঠিন। এ গুণ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। আমি আমার শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর যবানে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর একটি কথা অনেকবার শুনেছি। তিনি বলেছেন : 'এটা বোধগম্য নয় যে, মহামানব হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব হলো, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অন্তর আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত। অহী নাযিল হচ্ছে, ফেরেশতা অবতীর্ণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য দীপ্তিময় হচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর এসব কিছু চলছে। এমন শানদার মাকাম যাঁর, সেই মহামানব কীভাবে আবার পরিবার-পরিজনের সাথেও খোশগল্প করেছেন। কী করে তিনি দুনিয়ার কথাও বলেছেন। দেখুন, রাতের বেলায় তিনি আয়েশা (রা.)কে এগারো বিবির কাহিনীও শোনাচ্ছেন যে, এগারোজন বিবি ছিলো, যারা পরস্পর সংকল্প করেছিলো যে, আজ আমরা একে অপরকে নিজেদের স্বামীর অবস্থা শোনাবে। কার স্বামী কেমন, আজ সকলেই এর বিবরণ দেবো। এ বলে প্রত্যেক বিবি নিজের স্বামীর বৃত্তান্ত ব্যক্ত করা শুরু করলো। এভাবে একে একে অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় নিজের স্বামীর অবস্থা খুলে খুলে বললো। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গল্পটা হযরত আয়েশা (রা.)কে বলে যাচ্ছেন। এটা সত্যিই আশ্চর্য নয় কি! [শামায়েলে তিরমিযী]

হযরত থানবী (রহ.) বলেন : এ আশ্চর্য বিষয়টি আগে আমার বুঝে আসতো না। ভাবতাম, যে মহান ব্যক্তিত্ব প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখছেন, তিনি কীভাবে আয়েশা (রা.)-এর সাথে এবং অন্যান্য বিবির সাথে খোশগল্প করেন? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি এখন আর আমার কাছে জটিল মনে হয় না। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং বান্দার সাথে হাসি-গল্প একই সাথে চলতে পারে। কারণ, এসব হাসি-গল্পও তো মূলত আল্লাহর জন্যই। পরিবার-পরিজনকে খুশি করার হকও তো আমার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত। এ হক পূরণ করতে হলে একটু আনন্দ তো করতে হবেই। এ আনন্দের কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না, দুর্বলও হবে না। সম্পর্কের মাঝে ত্রুটিও দেখা দেবে না, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহপ্রেম বাড়বে বই কমবে না।

মহব্বত প্রকাশের মাঝেও রয়েছে সওয়াব

এক লোক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলো : হযরত! স্বামী-স্ত্রী যদি হাসি-গল্প করে, একে অপরের প্রতি মহব্বত দেখায় আর সে মুহূর্তে তার অন্তরে এ কল্পনাও নেই যে, আমরা এসব করছি আল্লাহর বিধান পালনার্থে, তাহলে তখনও কি সওয়াব পাওয়া যাবে? উত্তরে ইমাম আবু হানীফা বললেন : হ্যাঁ, সওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা এতেও সওয়াব দান করবেন। এক্ষেত্রে শুধু একবার নিয়ত করলেই চলবে যে, হে আল্লাহ! আমি এসব কিছু আপনার জন্যই করছি। আপনার বিধান পালনার্থে করছি। এরূপ নিয়ত একবার করলেই ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। প্রতিবার এবং প্রতি মুহূর্তে এ নিয়ত করা জরুরী নয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে, প্রতিটি কাজ এ লক্ষ্যেই করবে

এজন্য হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত করবে। যিকির-আযকার ও অযীফা-তাসবীহ পড়বে। তারপর একবার আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করবে যে,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الانعام : ١٦٢)

'হে আল্লাহ! আজকের দিনে যা কিছু করবো, আপনাকে রাজি-খুশি করার জন্যই করবো। উপার্জন করবো তো আপনাকে রাজি-খুশি করার জন্য করবো। বাড়ি-ঘরে যাবো, তাও আপনার হুকুম পালন করার জন্যই যাবো। বিবি-বাচ্চার সাথে কথা বলবো, সেটাও আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই বলবো। যেহেতু আপনি আমার জন্য এসব হক অপরিহার্য করেছেন, তাই এসব হক পূরণার্থে আমি এ কাজগুলো করবো।

এভাবে একবার নিয়ত করে নিলে এসব কাজ আর দুনিয়ার কাজ হবে না। বরং এসব হবে দ্বীনের কাজ, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার কাজ। তখন এসব কাজের কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্কও নষ্ট হবে না; বরং সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহপ্রেম আরো শক্তিশালী হবে।

হযরত মজযুব ও আল্লাহপ্রেম

যেসব মনীষী হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর খেদমতে দীক্ষা লাভ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এ জাতীয় বিশেষত্ব দান করেছেন। একটি কাহিনী আমার আব্বাজানের মুখে কয়েকবার শুনেছি। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহ.) হযরত থানবীর একজন শীর্ষস্থানীয় খলীফা ছিলেন। একবার তিনি এবং আমরা অমৃতসরে হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান (রহ.)-এর

মাদরাসায় জমায়েত হয়েছি। তখন আমের মৌসুম ছিলো। রাতের আহারের পর সকলেই আম খাচ্ছিলো। গল্পসল্পও খুব জমে উঠেছিলো। হযরত মাজযুব (রহ.) কবি ছিলেন। তিনি সকলকে অনেক কবিতা শোনালেন। রস-গল্প, কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এভাবে ঘণ্টাখানেক সময় চলে গেলো। এরই মধ্যে হযরত মাজযুব (রহ.) আচমকা একটা প্রশ্ন করে বসলেন যে, দেখো, প্রায় এক ঘণ্টা হলো আমরা গপশপে ব্যস্ত ছিলাম। এই ফাঁকে কার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে গেছে? আমরা বললাম : যেহেতু সকলেই আনন্দ-রসে মশগুল, সুতরাং সবার অন্তরই এতক্ষণ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল ছিল। শুনে হযরত খাজা মাজযুব (রহ.) বললেন : আল্লাহর ফজলে ও করমে আমি এই পুরা সময়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হইনি।

লক্ষ্য করুন, আনন্দ-রস, গল্প-গুজব এমনকি কবিতা পাঠ-শ্রবণ সবই চলেছে। অথচ তিনি বলছেন : 'আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে ছিটকে পড়িনি; পুরোটা সময় আমার অন্তর ছিলো আল্লাহর অভিমুখে।

এ জাতীয় অবস্থা অনুশীলন ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা দয়া করে যদি এর কিছু অংশও আমাদেরকে দান করেন, তখন বুঝে আসবে এটা কত বড় নেয়ামত।

অন্তরের কাঁটা আল্লাহর দিকে

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর একটি পত্র আমি দেখেছি। পত্রটি লিখেছিলেন হযরত থানবী (রহ.)-এর নামে। সেখানে লেখা ছিলো, "হযরত! আমি অন্তরের হালত অনুভব করছি। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্বদা উত্তর দিকে থাকে, অনুরূপভাবে আমার অন্তরের অবস্থা হলো, আমি মাদরাসায়, বাসায়, দোকানে কিংবা মার্কেটে যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি অনুধাবন করি যে, আমার অন্তরের কাঁটা সর্বদা থানাভবনের দিকে ফিরে আছে।"

আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা আমাদেরকে দান না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এর প্রকৃত মর্ম আমরা কীভাবে বুঝবো। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে এটা হাসিল হয়। মানুষ যখন চলাফেরায়, উঠাবসায় মোটকথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মত্ত থাকবে, তখন ধীরে ধীরে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে। যবানে কথা চললেও অন্তর থাকবে আল্লাহর দিকে। এরূপ অবস্থা আল্লাহ আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা অন্তরকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো প্রতিটি দুআর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মানুষের অন্তর সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে থাকবে। আল্লাহ এ অন্তরকে সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য। নাক, কান, যবানসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

পার্থিব প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু এ অন্তর কেবল আল্লাহর জন্যই থাকবে। আল্লাহ চান, এ অন্তর তেজোদীপ্ত হোক তাঁর পবিত্র নূর দ্বারা। তাঁর মহব্বতে সিক্ত হোক, তাঁর যিকিরের মাধ্যমে আবাদ হোক এ অন্তর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "সর্বোত্তম আমল হলো, যবানকে আল্লাহর যিকির দ্বারা তরতাজা রাখা।" যবান হলো হৃদয়ে পৌছার বাহন। যবানে যিকির করবে, ইনশাআল্লাহ তা হৃদয়ে পৌছে যাবে। তরিকত, তাসাউফ ও সুলূকেরও মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, হৃদয় যেন আল্লাহর স্মরণ ও মহব্বতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লি যেন অন্তরকে সতেজ করে তোলে।

মজলিসের দুআ ও কাফফারা

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন : যে মজলিসে আল্লাহর কথা আলোচনা করা হবে না, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহর রাসূলের জন্য আমাদের জান কুরবান হোক। তিনি আমাদের মত গাফেল ও দুর্বলদেরকে সতেজ করার জন্য হৃদয় জাগানিয়া সহজ সহজ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : যখন কোনো মজলিস থেকে উঠে যাবে, তখন এ দুআটি পড়বে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (ابو داود، كتاب الادب، الرقم : ٤٨٥٩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মজলিস ত্যাগ করার সময় এ দুআটি পড়বে, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ মজলিস কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে না। মজলিসের সকল দোষ-ত্রুটি তথা সগীরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন। কবীরা গুনাহ কিন্তু তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দোষচর্চা, মিথ্যা বলা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, মজলিসে যেন এ জাতীয় কবীরা গুনাহ না হয়।

ঘুমকেও ইবাদত বানাও

হাদীসটির পরবর্তী বাক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجِعًا لَا يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এমন কোনো বিছানায় ঘুমালো যে, ঘুমের পুরো সময়টিতে একবারও আল্লাহর নাম নেয়নি, তাহলে এ শোয়াটাও কিয়ামতের দিন তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। সে আফসোস করে বলবে, হায়! আমি অমুক দিন শুয়ে ছিলাম, অথচ আল্লাহকে স্মরণ করিনি, ঘুমের পূর্বে দুআ পড়িনি, ঘুম থেকে উঠেও দুআ পড়িনি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন পূর্বে ও পরে কী দুআ পড়বে। আসলে একজন মুমিনও ঘুমায়, কাফেরও ঘুমায়। কিন্তু উভয়ের ঘুমের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাফের ঘুমের সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করে না; মুমিন ঘুমের সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করে। বিধায় মুমিনের ঘুমও পরিণত হয় ইবাদতে। এটাই পার্থক্য।

যদি তুমি আশরাফুল মাখলুকাত হও

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরীকা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমরা চতুষ্পদ জন্তু এবং কাফের থেকে আলাদা হতে পারি। ঘোড়া-গাধাও ঘুমায়। সকল চতুষ্পদ জন্তুও ঘুমায়। তুমি যদি সৃষ্টির সেরা জীব হও, তাহলে তাদের মত ঘুমিয়ো না। শয়নে, জাগরণে আল্লাহর নাম নাও। নিজের স্রষ্টার কথা স্মরণ কর। এ লক্ষ্যেই দুআ শেখানো হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এসব দুআ নিয়মিত পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মৃত গাধার মজলিস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

(ابو داود، كتاب الادب، رقم الحديث ٤٨٥٥)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জাতি এমন কোনো মজলিস ত্যাগ করলো, যেখানে আল্লাহর স্মরণ ছিলো না, তাহলে এ মজলিস যেন মৃত গাধার মজলিস। আর কিয়ামতের দিন মজলিস দুঃখের কারণ হবে।

নিদ্রা আল্লাহ তাআলার দান

শোয়া ও ঘুমানোর আদব সম্পর্কে আলোচনা চলছে। আগেও বলেছিলাম যে, জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কোন সময়ে আমাকে কী করতে হবে, এসব স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। ঘুমও আল্লাহ তাআলার অনন্য একটি নিয়ামত। ঘুম না আসা মস্ত বড় এক মসিবত। আল্লাহ তাআলা নিজ রহম ও করমে এ মসিবত থেকে প্রতিদিন আমাদেরকে রক্ষা করেন। এখন এর জন্য বিশেষ কোনো

মেহনতেরও প্রয়োজন হয় না। ঘুমোতে চাইলেই আমরা ঘুমোতে পারি। এ ঘুম আনার জন্য শরীরের কোনো সুইচও টিপতে হয় না। প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের ঘুম চলে আসে। এটা একমাত্র আল্লাহর দান।

রাত আল্লাহ তাআলার এক বড় নেয়ামত

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন : একটু চিন্তা করো যে, ঘুমের সিস্টেম হলো, ঘুমের প্রতি আগ্রহ একই সময়ে সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয়। নিয়ম যদি এর ব্যতিক্রম হতো। এ ব্যাপারে যদি প্রত্যেকেই স্বাধীন থাকতো। যদি যে যখন ইচ্ছা তখন ঘুমাতে পারতো। যেমন এক ব্যক্তির মনে চাইলো সকল আটটায় ঘুমাবে। আরেক ব্যক্তি ইচ্ছা করলো দুপুর বারটায় ঘুমাবে। আরেক ব্যক্তির আগ্রহ হলো বিকাল চারটায় ঘুমাবে। তাহলে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? এর অনিবার্য ফল হবে যে, কেউ ঘুমাবে আর কেউ কাজে ব্যস্ত থাকবে। একজন ঘুমাবে আর অন্যজন মাথার উপর খটখট করবে। এভাবে আরামের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বজগতের জন্য একটাই নিয়ম রেখেছেন। মানুষ, পশু, পাখিসহ সকল প্রাণীই একই সময় ঘুমায়।

আব্বাজান আরো বলতেন : একই সময়ের ঘুমানোর লক্ষ্যে কোনো আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছে কি? পৃথিবীর সকল বাসিন্দাকে ডেকে কোনো পরামর্শ সভা হয়েছে কি যে, তোমরা কে কখন ঘুমাবে? বিষয়টির সমাধানের দায়িত্ব যদি মানুষের উপর দেয়া হতো, তাহলে বিশাল সমস্যা সৃষ্টি হতো। পৃথিবীর সকল মানুষ একই সময় ঘুমাবে– এ সিদ্ধান্ত মানুষ কি নিতে পারতো? এটা তো একমাত্র আল্লাহর দয়া ও করুণা। তিনি সকলের মনে এক অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। রাত হলে সকলের মধ্যে তিনি ঘুমের ঝোঁক সৃষ্টি করেন। সকলের একটাই অনুভূতি যে, রাতে ঘুমাতে হবে। সকালে উঠতে হবে। সকলের ঘুম এজন্য একই সময় চলে। এ মর্মে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (سورة الانعام : ٩٦)

'আমি (আল্লাহ) রাতকে সৃষ্টি করেছি আরাম করার জন্য।' দিবসকে সৃষ্টি করেছি উপার্জনের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য। সুতরাং বোঝা গেলো, ঘুম হলো আল্লাহর এক বিশেষ দান। তাই একে কাজে লাগাও। আর একটু স্মরণ করো যে, এই দানটা কার? এজন্য শোকর আদায় করো। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কল্পনা করো। এটাই হলো সারকথা। আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মানে গুনাহমুক্ত জীবন। সেই মানুষ থেকে তখন গুনাহ প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় যথাসাধ্য ইবাদত করার এক বিরামহীন চিত্র, উত্তম চরিত্র অর্জনের এক চমৎকার অনুশীলন এবং অধম চরিত্র থেকে বাঁচার এক নিরলস প্রচেষ্টা। এসব কিছু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার কারণেই অর্জিত হয়।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاِسْمِهٖ، عِمَامَةً اَوْقَمِيْصًا اَوْرِدَا؛ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ (تِرْمِذِيْ، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا ، حديث نمبر ١٧٦٧)

নতুন কাপড় পরিধানের দুআ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, তিনি যখন নতুন কোনো কাপড় পরিধান করতেন, তখন কাপড়ের নাম নিতেন। যেমন পাগড়ি হলে পাগড়ির নাম নিতেন, জামা হলে জামার নাম নিতেন এবং এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

(تِرْمِذِيْ، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا حديث نمبر ١٧٦٧)

'হে আল্লাহ! আপনার শোকর আদায় করছি যে, আপনি আমাকে পোশাক পরিধান করিয়েছেন। আপনার কাছে পোশাকটির কল্যাণ কামনা করছি। পোশাকটিকে যে কল্যাণমূলক কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে কল্যাণ চাচ্ছি। পোশাকটির অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে মন্দ কাজের জন্য পোশাকটি বানানো হয়েছে, সেই মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

সব সময়ের জন্য দুআ এক নয়

পোশাক পরিধানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআটি পড়তেন। এটা তাঁর সুন্নাত। দুআটি জানা না থাকলে নিজের ভাষায় হলেও দুআ করবে। উম্মতের উপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ই ইহসান যে, তিনি উম্মতকে প্রতিটি কাজে দুআ করার তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তো দুর্বল উম্মত। আমাদের প্রয়োজনের শেষ নেই। অথচ চাওয়ার পদ্ধতির জানা নেই। কীভাবে চাইবো, কী চাইবো– তাও জানা নেই। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে, আল্লাহর নিকট এভাবে চাও। মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক কাজ করে। প্রায় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দুআ রয়েছে। যেমন ঘুম থেকে জাগ্রত হলে এই দুআ পড়বে। নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দুআ পড়বে। তারপর ইবাদত শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এই দুআ পড়বে। ঘরে প্রবেশকালে এই দুআ পড়বে। বাজারে যাওয়ার সময় এই দুআ পড়বে। এভাবে প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট দুআ রয়েছে। এটা উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে কেন ভিন্ন ভিন্ন দুআ শিক্ষা দিয়েছেন? মূলত এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন যে, বান্দা যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো, মানুষ সব সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। দুআ করতে থাকবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ : ٤١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাঁর যিকির করো।"

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম আমল কোনটি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন–

اَنْ يَكُوْنَ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ (تِرْمِذِىْ، كِتَابُ الدَّعْوَاتِ، رقم الحديث : ٣٣٧٢)

তোমার যবান আল্লাহর যিকির দ্বারা সর্বদা তরতাজা থাকা। যবানে সব সময় যিকির চলতে থাকা।

সারকথা, অধিকহারে যিকির করার কথা যেমনিভাবে কুরআন শরীফে এসেছে, অনুরূপ এর ফযীলত রাসূল (সা.)-এর হাদীসেও এসেছে।

আল্লাহ তাআলা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন

প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা সব সময় অধিক যিকির করার নির্দেশ দিলেন কেন? আমরা যিকির করলে আল্লাহর কি কোনো ফায়দা হয়? তিনি কি এতে মজা পান? যিকির কি তার খুব প্রয়োজন?

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে, সে একথার কল্পনাও করতে পারে না। কারণ, বিশ্বজগতের সবকিছু যদি আল্লাহর যিকির করতে থাকে, যদি সকলে মিলে প্রতিটি মুহূর্তে শুধু আল্লাহকে ডাকতে থাকে, তাহলেও আল্লাহর বড়ত্বে, মহত্বে, তাঁর জালালে ও জামালে এক সরিষা পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই গোটা বিশ্বজগতের সকলে মিলে এই অঙ্গীকার করে যে, কেউই আল্লাহর যিকির করবে না, সকলেই তাঁকে ভুলে যাবে, তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, গুনাহ আর নাফরমানীতে মত্ত থাকবে, তাহলেও আল্লাহর বড়ত্বে ও মহত্বে সামান্য পরিমাণও ত্রুটি আসবে না। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি আমাদের সিজদা, তাসবীহ কিংবা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন।

সকল মন্দের মূল আল্লাহকে ভুলে যাওয়া

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকিরে আমাদেরই লাভ। তাঁকে যত বেশি স্মরণ করবো, তত বেশি ফায়দা লাভে ধন্য হবো। কারণ, যদি আমরা দুনিয়ার সমূহ অপরাধ, অসভ্যতা ও অনিষ্টতার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিই, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর পেছনে রয়েছে আল্লাহবিস্মৃতি। মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তখনই গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খায়। আর আল্লাহর কথা স্মরণে থাকলে, তাঁর যিকিরে ও ফিকিরে থাকলে এবং তাঁর সামনে হাজির হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত থাকলে মানুষ কখনও গুনাহর অতলে তলিয়ে যায় না।

চোর যখন চুরি করে, তখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। আল্লাহর নাম হৃদয়ে থাকলে চোর কখনও চুরি করতে পারে না। অপরাধীর অপরাধের সময় আল্লাহর ক্ষমতা মনে থাকে না। থাকলে সে অপরাধ করতে পারে না। এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا يَشْرِبُ الشَّارِبُ حِيْنَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(صَحِيْحِ مُسْلِم، كِتَابُ الْاِيْمَانِ، رقم الحديث : ١٠٠)

অর্থাৎ– "যিনাকারী যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চৌর্যকর্ম করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপ মদপান করার সময় মুমিন থাকে না।"

'মুমিন থাকে না' এর অর্থ ওই মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য তার অন্তরে ঈমান বর্তমান থাকে না তথা ওই মুহূর্তে তার অন্তরে আল্লাহর কথা বিদ্যমান থাকে না। যদি তার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ থাকত, তাহলে সে এসব অপরাধ করতো না। সুতরাং সকল অন্যায়, অপরাধ, অনিষ্টতা ও অসভ্যতার মূল হলো আল্লাহকে ভুলে যাওয়া।

আল্লাহ কোথায় গেলেন?

একবার হযরত উমর (রা.) মরুপ্রান্তরে সফরে বেরিয়েছেন। বর্তমানের মত সে যুগে যেখানে সেখানে হোটেল পাওয়া যেতো না। এরই মধ্যে তাঁর ক্ষুধা লেগেছে। সব পাথেয়ও ফুরিয়ে গেছে। তাই এদিক-সেদিক জনবসতি খুঁজতে লাগলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্য করলেন, মাঠে প্রচুর ছাগল। তিনি রাখালের খোঁজে পালের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগলেন। পেয়েও গেলেন। রাখালের কাছে গিয়ে বললেন : আমি একজন মুসাফির। আমার সকল সামগ্রী শেষ হয়ে গেছে। আমাকে একটু দুধ পান করাতে পারবে? ঘটনাটি ছিলো তখনকার, যখন হযরত উমর (রা.) ছিলেন অর্ধপৃথিবীর শাসক। আরবদের মধ্যে অসহায় মুসাফিরদেরকে দুধপান করানোর রেওয়াজ সেই যামানায় ছিলো খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি সেই রেওয়াজ মাফিকই চাইলেন।

রাখাল ছেলেটি উত্তর দিলো : আমি আপনাকে অবশ্যই দুধ পান করাতাম। কিন্তু সমস্যা হলো, এই বকরীগুলোর মালিক আমি নই। আমি এগুলোর রাখাল মাত্র। এগুলো তো আমার কাছে আমানত। তাই আপনাকে আমি দুধ পান করাতে পারছি না।

উমর (রা.) ভাবলেন, ছেলেটির একটু পরীক্ষা হওয়া দরকার। তাই তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা চমৎকার প্রস্তাব করছি। এতে তোমারও লাভ হবে, আমারও উপকার হবে। তুমি আমার কাছে একটা বকরী বিক্রি করে দাও। এতে তুমি পয়সা পাবে। আর আমিও পথে দুধ পান করতে পারবো। মালিকের কথা ভাবছো? তাকে বলে দিবে একটি বকরী বাঘে খেয়ে ফেলেছে। মালিক নিশ্চয় তোমার কথা বিশ্বাস করবে। কারণ, বাঘ এমন কাণ্ড মাঝে-মধ্যেই ঘটায়! এতে তোমারও লাভ হলো, আর আমিও উপকৃত হবো। এ প্রস্তাব শোনামাত্র রাখাল বলে উঠলো–

يَا هٰذَا! فَأَيْنَ اللّٰهُ

'আরে মিয়া! তাহলে আল্লাহ কোথায় গেলেন?'

অর্থাৎ– আল্লাহ কি দেখবেন না আমার কাণ্ড! কেবল মালিককে সামলালেই হবে? মালিকেরও তো মালিক আছেন! তাঁর কাছে কী জবাব দেবো। ভাই! তোমার প্রস্তাব মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা।

যিকির ভুলে গেছে, অপরাধ বেড়ে গেছে

রাখালের পরীক্ষা হয়ে গেলো। সে পরীক্ষায় টিকে গেলো। মূলত একেই বলে আল্লাহর যিকির, আল্লাহর স্মরণ। একাকী প্রান্তরে, নির্জন অন্ধকারেও হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে আল্লাহর স্মরণ। উমর (রা.) রাখালের উত্তর শুনে বললেন : সত্যিই তোমার মত মানুষ যত দিন এ পৃথিবীতে থাকবে; যত দিন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি আর আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেতনা জাগ্রত থাকবে, তত দিন অন্যায়-অত্যাচার স্থান পাবে না পৃথিবীতে।

বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে, অলিতে গলিতে চৌকিদার বসানো হচ্ছে। তবুও মানুষ নিজের নিরাপত্তা পাচ্ছে না। ডাকাতি, সন্ত্রাস, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। কারণ, অপরাধের মূল চালিকাশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি অন্তরে না জাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ ফৌজ আর প্রশাসন যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, কোনো কাজ হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যায়-অপরাধ দমন হবে না। বরং তখন ঘরের ইঁদুরই বেড়া কাটবে আর পাহারাদার নিজেই চুরি করবে।

রাসূল (সা.) অপরাধ দমনের পদ্ধতি বলেছেন

অপরাধ দমন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, আদালত নেই, ফৌজ নেই; অথচ অপরাধী নিজেই নিজেকে পেশ করে দিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছে আর নিজের অপরাধ নিজেই স্বীকার করে বলেছে : হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুনাহ করেছি, অপরাধ করেছি। আমাকে এ দুনিয়াতেই শাস্তি দিন এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আমাকে প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে মেরে ফেলুন। কারণ, আমি তো মহা অপরাধী।

এরূপ পবিত্র সমাজের কল্পনা তখনই করা যেতে পারে, যখন মানুষের অন্তর আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে জাগ্রত থাকবে, মানুষ যখন আল্লাহকে অধিকহারে

স্মরণ করবে। তাই বলা হয়েছে, যত বেশি পার আল্লাহকে স্মরণ কর। তাহলে ইনশাআল্লাহ সকল অন্যায়-অপরাধের মূলোৎপাটন হয়ে যাবে।

আল্লাহকে ডাকতে হবে

অনেকে বলে, মুখে শুধু 'আল্লাহ-আল্লাহ' করলে অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বললে কিংবা 'আলহামদুলিল্লাহ' জপলে আর মন ও চেতনা অন্য দিকে থাকলে কী ফায়দা হবে? মনে রাখবেন, মুখের যিকির হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রথম সিঁড়ি। এ সিঁড়ি অতিক্রম করেছ তো অন্তত একটা ধাপ জয় করে নিয়েছ। এর বরকতে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হতে পারবে। সুতরাং মুখের যিকিরকে অনর্থক মনে করো না। এটাও আল্লাহর নেয়ামত। শরীরের সমস্ত অঙ্গ আল্লাহর যিকিরে না থাকলেও কমপক্ষে একটা অঙ্গ তো তাঁর স্মরণে ব্যস্ত থাকলো। এভাবেই তো মানুষ উন্নতি লাভ করে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার তাৎপর্য

অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা, তাঁর নাম অঙ্কিত থাকার অপর নামই হলো তাআল্লুক মাআল্লাহ। অর্থাৎ– সব সময় যে-কোনোভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। তাসাউফের মূল কথা এটাই যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। কারণ, এ সম্পর্ক যখন মজবুত হবে, তখন আর গুনাহর প্রতি মন যাবে না। এ ধরনের মানুষ থেকে তখন গুনা' প্রকাশ পায় না। বরং প্রকাশ পায়, সাধ্যানুযায়ী ইবাদত করার এক বিরামহীন চিত্র, উত্তম চরিত্র অর্জনের এক চমৎকার অনুশীলন এবং অধম চরিত্র থেকে বাঁচার এক নিরলস প্রচেষ্টা। এসব কিছু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার পরই অর্জন করা যায়।

সর্বদা প্রার্থনা করো

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক মজবুত করার নেয়ামত অর্জনের লক্ষ্যে সূফীগণ ব্যাপক রিয়াজত-মুজাহাদার কথা বলে থাকেন। কিন্তু ডা. আবদুল হাই আরেফী [রহ.] বলতেন : এর জন্য আমি সহজ ও সংক্ষিপ্ত একটি পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। সেটা হলো, তোমরা ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর কাছে চাও। প্রতিটি বিষয় তাঁর কাছে কামনা কর। দুঃখ, কষ্ট, পেরেশানী, প্রয়োজন, মসিবতসহ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। যেমন গরম অনুভব করলে বলবে, হে আল্লাহ! গরম দূর করে দিন। বিদ্যুৎ চলে গেলে বলবে, হে আল্লাহ! বিদ্যুৎ দান করুন। ক্ষুধা অনুভূত হলে বলবে, হে আল্লাহ! ক্ষুধা নিবারণ করে দিন। ঘরে প্রবেশকালে বলবে, হে আল্লাহ! ঘরে যেন সবকিছু সুন্দর দেখি। অফিসে যাওয়ার সময় বলবে, হে আল্লাহ! সবকিছু যেন ঠিক থাকে। দুঃখের

খবর শুনে বলবে, হে আল্লাহ! দুঃখ ঘুচিয়ে দিন। বাজারে প্রবেশের সময় প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! সবকিছু ঠিক দামে ঠিকভাবে কেনার তাওফীক দান করুন। মোটকথা, সর্বাবস্থায় সব মহলে কেবল আল্লাহর নিকট চাইবে, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে।

ছোট একটা চমক

ব্যাপার হলো, এটা তো একটা ক্ষুদ্র কাজ। একেবারে সহজ। তাই এর কদর নেই। অন্যথায় বাস্তবে এটি খুবই ফলদায়ক। আল্লাহর কাছে চাও। সর্বদা চাও। প্রতিটি কাজে চাও। বলো, আল্লাহ! কাজটি করে দাও। তাহলে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে। যেমন কেউ আপনার সাথে দেখা করতে আসছে। আপনি এটা লক্ষ্য করলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যান, মনে মনে দুআ করা শুরু করুন যে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি যেন খুশির খবর আনে। যেন দুঃখের সংবাদ না আনে। সে যে কথা বলতে চায়, তার ফলাফল যেন ভালো হয়। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। দুআ করুন, হে আল্লাহ! ডাক্তারের মনে সঠিক চিকিৎসা দান করুন। সঠিক ওষুধের কথা তার অন্তরে পয়দা করে দিন।

হযরত ডা. সাহেব বলেন : ব্যাপারটা যদিও ছোট; কিন্তু এতে চমক রয়েছে। এর মাধ্যমে অন্তরে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। উন্নতির শীর্ষ আসনে পৌঁছুতে পারে।

যিকিরের জন্য কোনো স্থান-কাল নেই

মাসনুন দুআগুলোর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে আল্লাহর দিকে আনতে চেয়েছেন। আল্লাহর কাছে চাওয়ার অভ্যাস উম্মতের মাঝে সৃষ্টি হোক– এটাই ছিলো তাঁর তামান্না। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর কাছে চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। এর জন্য কোনো স্থান-কাল নেই। যেকোনো অবস্থায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করা যায়। এর জন্য অযুর প্রয়োজন হয় না। কিবলামুখী হওয়ার দরকার হয় না। এমনকি জানাবতের হালতেও তাঁর কাছে প্রার্থনা করা যায়। এ অবস্থায় তেলাওয়াত করা যায় না; কিন্তু দুআ করা যায়। এমনকি বাথরুমে বসেও মনে মনে দুআ করা যায়। যদিও তখন মুখে দুআ করা যায় না, কিন্তু মনে মনে করা যায়।

আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য যেমনিভাবে স্থানের প্রয়োজন নেই, বিশেষ কোনো সময়ের প্রয়োজন নেই, অনুরূপভাবে বিশেষ কোনো তরীকাও নেই। সুযোগ হলে অযু করে, কিবলামুখী হয়ে, হাত তুলে দুআ করবে। আর সুযোগ না পেলে এসব ছাড়াই দুআ করবে। যবানে দুআ করতে হবে এমন কোনো কথা

নেই। ইচ্ছা করলে মনে মনেও দুআ করতে পারবে। মোটকথা দুআর অভ্যাস করে নেবে।

হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন : অনেকে আমার কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে আসে। বলে, হযরত! একটা কথা জানতে চাই। তখন আমি সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি যে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি যে প্রশ্নটি আমাকে করবে, তার সঠিক উত্তর আমার অন্তরে ঢেলে দিন। হযরত বলেন : এ আমলটি আমি নিয়মিত করি। কোনো সময় এর ব্যতিক্রম হয় না।

মাসনুন দুআসমূহের গুরুত্ব

এরপরেও দুআর বিশেষ কিছু স্থান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বলেছেন : এসব স্থানে অবশ্যই দুআ করবে। এটা তো উম্মতের জন্য নবীজির দরদী ব্যবস্থা। দুআর ভাষা, পদ্ধতি ও বাচনভঙ্গি উম্মতের জানা নাও থাকতে পারে। তাই এই বাড়তি ব্যবস্থা। এখন আমাদের কাজ হলো শুধু এসব দুআ মুখস্থ করে নেয়া। সময়মতো সেগুলো পড়ে নাও। এ যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকানো রুটি উম্মতের জন্য পরিবেশন করলেন। উম্মত কেবল গিলবে। উম্মতের কাজ কেবল এতটুকু। তাছাড়া উম্মতের উলামায়ে কেরামও মাসনূন দুআসমূহের বিভিন্ন কিতাব সংকলন করেছেন। সেগুলোতে চমৎকারভাবে সূচিবিন্যাস করেছেন, যেন সর্বস্তরের মুসলমান এসব দুআর আমল সহজেই করতে পারে।

কিছুকাল পূর্বেও মুসলমানদের ঘরে ঘরে শিশুদেরকে বিভিন্ন দুআ শেখানো হতো। শিশুর মুখে কথা ফুটলেই শেখানো হতো, বেটা! খানার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। ফলে দুআর জন্য ভিন্ন ক্লাশের প্রয়োজন হতো না। কারণ, শিশুকালের শিক্ষা তো অত্যন্ত মজবুত হয়। বড় হলেও এ শিক্ষা মনে থেকে যায়।

যাক, সকলেই এসব মাসনুন দুআকে গনীমত মনে করা উচিত। এগুলো কিন্তু খুব বড় নয়। প্রায় সকল দুআই ছোট ছোট। প্রতিদিন একটি একটি মুখস্থ করে নেবেন। তারপর সুযোগমতো অবশ্যই পড়বেন। দেখবেন আল্লাহ তাআলা অফুরন্ত নুর ও বরকত কীভাবে দান করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব সময় তাঁর যিকির করার তাওফীক দান করুন। সারাক্ষণ তাঁকে স্মরণ করার তাওফীক দিন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

"আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যবান দিয়েছেন। এ নিয়ে গভীর ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। কথা বলার জন্য যবান এক অটোমেটিক মেশিন। যা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গ দিচ্ছে। এর জন্য পেট্রোল লাগে না, সার্ভিসের প্রয়োজন হয় না, মেরামতের দরকার হয় না। তবে আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, এই মেশিনের মালিক আমরা নই। এটা খোদাপ্রদত্ত মেশিন, যা আমাদের নিকট আমানত। সুতরাং এই মেশিন শুধু তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই ব্যবহার করতে হবে। যা মনে জাগলো, তাই বলে ফেললাম— এমন যেন না হয়। সতর্কতার সাথে এর ব্যবহার করতে হবে। যে কথা আল্লাহর বিধানমাফিক হবে, কেবল তা-ই বলতে হবে। অন্য কোনো কথা বলা চলবে না।"

যবানের হেফাযত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

যবানের হেফাযত বিষয়ক তিনটি হাদীস

প্রথম হাদীস–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ

(صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كِتَابُ الْاَدَبِ)

"সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মানুষ আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" [বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব]

দ্বিতীয় হাদীস–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَنْزِلُ بِهٖ فِي النَّارِ بَعْدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো কথা বলে ফেলে, তখন ওই কথা তাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব যতটুকু সেই পরিমাণ দোযখের গর্তের ভিতরে ফেলে দেয়।" [বুখারী শরীফ]

এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তৃতীয় আরেকটি হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَلْقٰى بِهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ، وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَلْقٰى بِهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ

(صَحِيْح بُخَارِىْ، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان)

"আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো কোনো সময় মানুষ আল্লাহ তাআলা খুশি হন এমন কথা বলে। অর্থাৎ– এমন কথা বলে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। কথাটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়। কিন্তু যখন সে বলে, তখন তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। অনেকটা বে-খেয়ালেই বলে। অথচ আল্লাহ তাআলা ওই কথার উসিলায় জান্নাতে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। পক্ষান্তরে কিছু লোক এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। কথাটি হয়তো সে বে-খেয়ালেই বলে; কিন্তু কথাটি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।" [বুখারী শরীফ]

যবান সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

হাদীস তিনটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষ যেন যবানের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহ তাআলা খুশি হন– যবানকে যেন এমন কাজে লাগানো হয়। তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে যেন যবানকে বিরত রাখা হয়। আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এজন্য যবান দ্বারা সংঘটিত গুনাহসমূহের আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ, যবানের গুনাহ অনেক ক্ষেত্রে অসতর্কতাবশত হয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা অনেক সময় বলে ফেলে, যার পরিণতিতে তাকে যেতে হয় দোযখে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দেখে-শুনে যবানের ব্যবহার কর। ভালো কথা বলার থাকলে বলো, অন্যথায় চুপ থাকো।

যবান এক মহা নিয়ামত

যবান আল্লাহর দান। ভাবা প্রয়োজন, এটা আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। তাঁর কত বড় পুরস্কার এ যবান। চাওয়া ছাড়াই তিনি কথা বলার এ মেশিন আমাদেরকে দান করেছেন। এটি আজীবন আমাদের সাথে থাকে। এ এক

অটোমেটিক মেশিন। মনে কিছু একটা জাগলেই সে বলতে শুরু করে। পেট্রোল, ব্যাটারি কিংবা কোনো সার্ভিস ছাড়াই চলতে থাকে এটি। অথচ এ মহান নেয়ামতের কদর আমাদের কাছে নেই। কারণ, এটি অর্জন করতে কোনো পরিশ্রম আমরা করিনি। কিংবা টাকা-পয়সারও প্রয়োজন হয়নি। বিনা পরিশ্রমে আর বিনা পয়সায় আমরা পেয়ে গেছি আল্লাহর এ নিয়ামত। ফ্রি জিনিসের কদর মানুষের কাছে থাকে না। তাই এটারও নেই। যা ইচ্ছা তা-ই বলে ফেলি। এ নেয়ামতের মূল্য সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা বাক্শক্তিহীন, যবান থাকা সত্ত্বেও যারা কথা বলতে পারে না। হৃদয়ে ভাব জাগে; কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। এদেরকে যবানের মূল্য কত জিজ্ঞেস করুন। তারাই বোঝে, এটা আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত, কত বড় পুরস্কার।

যদি বাক্শক্তি চলে যায়

আল্লাহ না করুন যদি যবান তার কাজ বন্ধ করে দেয়, বলার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি বাক্শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়– তখন কি মারাত্মক অবস্থা দেখা দেবে! প্রকাশ! হায়রে প্রকাশের ব্যথা– মানুষকে কুরে কুরে খাবে। এই তো কয়েক দিন আগের কথা। আমার এক আত্মীয়ের অপারেশন হয়। অপারেশন কালের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন : "অপরাশনের পর কিছু সময় আমার সারা শরীর অবশ ছিলো। তখন খুব পিপাসাও পেয়েছিলো। চারপাশে আমার আত্মীয়-স্বজন বসে আছে। আমি কাউকে কিছু বলতে পারছিলাম না। ইঙ্গিতেও বোঝাতে পারছিলাম না। অথচ পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিলো। এ অবস্থায় প্রায় আধা ঘণ্টা পড়ে ছিলাম।" সুস্থ হওয়ার পর তিনি বললেন : ওই আধা ঘণ্টা সময় ছিলো আমার জীবনের সবচে কষ্টদায়ক সময়। আমি তখন সম্পূর্ণ অসহায় ছিলাম। এমন অসহায়ত্ব ও কষ্ট আর কোনোদিন অনুভব করিনি।

যবান আল্লাহর তাআলার আমানত

আল্লাহ তাআলা যবান ও মস্তিষ্কের মাঝে রেখেছেন এ সূক্ষ্ম কানেকশন। মস্তিষ্ক যখন ইচ্ছা করে, যবান কথা বলুক– যবান তখন কথা বলে। কথা বলার এ যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব যদি মানুষকে দেয়া হতো, যদি বলা হতো, তোমরা নিজেরা এ যন্ত্র চালাও, তাহলে মানুষের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো, এর পরিচালনা কৌশল শিক্ষা করার। যবানকে কোন দিকে কীভাবে ঘোরালে 'আলিফ' উচ্চারণ হবে, 'বা' উচ্চারণ হবে– এসব কিছু তখন মানুষকে শিখতে হতো। তখন কত বিড়ম্বনারই না শিকার হতো মানুষ! কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষের উপর দয়া

করেছেন। তিনি এক কুদরতি শক্তি মানুষের মাঝে জন্মগতভাবে রেখে দিয়েছেন। মানুষ যখন বলতে চায়, তখন ওই কুদরতি শক্তির সাহায্যে বলতে পারে। তাই মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, এ কুদরতি মেশিন সে তো নিজে খরিদ করেনি; বরং আল্লাহ দিয়েছেন। এটা তার মালিকানা সম্পত্তি নয়, বরং আল্লাহর দেয়া একটি আমানত। সুতরাং এ আমানতকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজেই ব্যয় করা উচিত। ভালো-মন্দ চিন্তা না করে যা মনে আসলো, তাই বলে ফেললাম– এটা মোটেই উচিত হবে না। কথা বলতে হবে ভেবে-চিন্তে; আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। আল্লাহর বিধানপরিপন্থী সকল কথা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এক কথায়, এটা আল্লাহপ্রদত্ত মেশিন। তাই ব্যবহার করতে হবে তাঁরই মর্জিমতো।

যবানের সঠিক ব্যবহার

এ যবান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এটিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে মানুষ বেহেশতেও পৌছে যেতে পারে। যেমন একটু আগে আপনারা হাদীস শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি ভালো কথা বললো। বলার সময় হয়ত সে ভাবেওনি যে, এটি একটি ভালো কথা। অথচ এর কারণে মহান আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তাকে অনেক সওয়াব দান করেন। কোনো কাফির যখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে, তখন যবানের মাধ্যমেই লাভ করে। কালিমায়ে শাহাদাত তো তখন এ যবান দ্বারাই উচ্চারিত হয়।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কালিমাটি পড়ার পূর্বে যে-লোক কাফের ছিলো, পড়ার পরে সেও মুসলমান হয়ে যায়। একটু আগে সে জাহান্নামী ছিলো, এখন হয়ে গেলো জান্নাতী। আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত লোকটি হয়ে গেলো আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এ মহান বিপ্লব তো শুধু এ কালিমা উচ্চারণের কারণেই ঘটলো, যা উচ্চারণ করেছে তার ক্ষুদ্র যবান দ্বারা।

যবানকে যিকিরের মাধ্যমে সতেজ রাখুন

ঈমানের অধিকারী হওয়ার পর কেউ যদি শুধু سُبْحَانَ اللّٰهِ পড়ে, হাদীস শরীফে এসেছে, এর দ্বারা 'মীযান' (আমল পরিমাপ করার দাড়িপাল্লা) এর অর্ধেক ভরে যায়। শব্দটি ছোট; কিন্তু সওয়াব অনেক বড়। অন্য হাদীসে এসেছে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ এ দু'টি কালিমা উচ্চারণে খুবই সহজ। কিন্তু 'মীযান'-এ খুবই ভারী এবং দয়াবান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

মোটকথা আল্লাহ তাআলা এ এক অনন্য মেশিন তৈরি করেছেন। যদি এর মোড় সামান্য পরিবর্তন করা যায়, একে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে দেখতে পাবেন, আপনার আমলনামায় নেকীর পাহাড় গড়ে উঠছে। আপনার জন্য বেহেশতী মহল তৈরি হচ্ছে। সর্বোপরি আল্লাহ রেজামন্দি লাভে ধন্য হচ্ছেন। সুতরাং আল্লাহর যিকিরের মাধ্যাম যবানকে সতেজ রাখুন। তাহলে দ্রুত আপনার অবস্থার উন্নতি ঘটবে। একবার এক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন : উত্তম আমল হলো যবানকে আল্লাহর যিকির দ্বারা ব্যস্ত রাখা। চলাফেরা, উঠা-বসায় সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির করা। [তিরমিযী শরীফ, যিকিরের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস : ৩৩৭২]

যবানের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিন

যদি এ যবানের মাধ্যমে আপনি দ্বীনের একটি ক্ষুদ্র বিষয়ও শিক্ষা দেন। যেমন কাউকে ভুল পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে দেখলেন। আপনি নির্জনে ডেকে নিয়ে নরমভাবে মহব্বতের সাথে বিষয়টি তাকে বোঝালেন যে, ভাই! তোমার নামাযে এ ভুল আছে। এটা এভাবে নয়, এভাবে আদায় করো। আপনার মুখের এ সামান্য কথায় তার নামায ঠিক হয়ে গেলো। তাহলে এ থেকে সারা জীবন যত নামায সে সহীহ তরিকায় আদায় করবে, সকল নামাযের সওয়াব আপনার আমলনামায়ও লিখা হবে।

সান্ত্বনার কথা বলা

কেউ দুঃখ ও পেরেশানীতে আছে। আপনি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন। এতে কাজ হলো। তার পেরেশানী কিছুটা সহজ হলো। সে কিছুটা স্থির হলো। তাহলে এ 'সান্ত্বনাবাক্য' বলার কারণে বহু সওয়াব ও নেকী পাবেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِىَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ

"কেউ যদি কোনো সন্তানহারা নারীকে সান্ত্বনামূলক কথা বলে, আল্লাহ তাআলা ওই সান্ত্বনাদাতাকে মূল্যবান দুই জোড়া পোশাক বেহেশতের মধ্যে পরাবেন।"

সারকথা, যবানকে নেকপথে পরিচালিত করুন। আল্লাহর বাতলানো পদ্ধতিতে কাজে লাগান। তারপর দেখুন, আপনার আমলনামায় কীভাবে নেকী

জমা হতে থাকে। যথা– কোনো পথহারা পথিককে সঠিক পথের সন্ধান দিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপনি একটি ক্ষুদ্র কাজই করেছেন। আপনি কল্পনাও করেননি– এটা কত বড় সওয়াবের কাজ। এর ফলে অগণিত নেকী আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করবেন।

মোটকথা, যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তার জন্য বেহেশতের দ্বার উন্মোচিত হবে। এর কারণে গুনাহ মাফ হবে। পক্ষান্তরে (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) যদি যবানকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এটি তাকে দোযখের পথে নিয়ে যাবে।

যবান মানুষকে দোযখে নিয়ে যাবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যারা দোযখে যাবে, তাদের অনেকেই যবানের গুনাহর কারণে যাবে। যথা মিথ্যা বলা, গীবত করা, কারো মনে কষ্ট দেওয়া, অশ্লীল কথা বলা, কারো কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করা ইত্যাদি– এসবই যবানের গুনাহ। এসব গুনাহর পরিণতি জাহান্নাম। হাদীস শরীফে এসেছে :

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ

অর্থাৎ– "মানুষ যবানের গুনাহের কারণে দোযখে যাবে।"

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতটিকে হেফাযত করতে হবে এবং সহীহভাবে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য বলা হয়েছে, হয়ত উত্তম ও নেক কাজের কথা বলো, অন্যথায় চুপ থাকো। কারণ, মন্দ কথার চাইতে চুপ থাকাই অধিক উত্তম।

ভালো-মন্দ বিচার করো, তারপর কথা বলো

প্রথমে চিন্তা-ভাবনা করো। ভালো-মন্দ বিচার করো। ওজন করো– তারপর কথা বলো। প্রয়োজনীয় উত্তম কথাই বলা উচিত। অধিক কথা বলা নিষেধ এজন্যই করা হয়েছে। কারণ, অধিক বকবক করলে যবান নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আর লাগামহীন যবানে অন্যায় কথা চলে স্বাভাবিক। তাই শুধু প্রয়োজনমতো কথা বলবে। অপ্রয়োজনে, অহেতুক কথা বলবে না। জনৈক বুযুর্গের ভাষায় : 'পহলে তোলো, ফের বোলো।' ওজন দিয়ে কথা বলার অভ্যাস করলে যবান নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

হযরত মিয়াঁ সাহেব (রহ.)

আমার আব্বাজানের একজন ওস্তাদ ছিলেন। নাম ছিল– হযরত মিয়াঁ আসগর হোসাইন। মিয়াঁ সাহেব নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক উঁচু মানের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁকে দেখলে সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়তো। তাঁর সঙ্গে আব্বাজানের গভীর সম্পর্ক ছিলো। এজন্য তিনি তাঁর নিকট ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতেন। মিয়াঁ সাহেবও আব্বাজানকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। আব্বাজান বলেন : এক দিন আমি মিয়াঁ সাহেবের খেদমতে গেলাম। তখন হযরত মিয়াঁ সাহেব বললেন : 'দেখ, ভাই মৌলভী শফী সাহেব! আজ আমরা উর্দুতে নয়; বরং আরবীতে কথা বলবো।' আব্বাজান বলেন : 'একথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। যেহেতু এর আগে কখনো এমন হয়নি। আজ মিয়াঁ সাহেব কেন আমাকে বসিয়ে আরবীতে কথা বলতে চাচ্ছেন!' তাই আমি কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম : 'হযরত! আজকের কথাবার্তা আরবীতে চলবে কেন?' তিনি উত্তর দিলেন : 'এমনিতেই, মনে আসলো– তাই।' আমি কারণ জানাতে পীড়াপীড়ি করলাম। তখন তিনি বললেন : 'আসল কথা হলো, আমরা দু'জন যখন কথাবার্তা শুরু করি, তখন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় আমরা গলদ কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। তাই আমি ভাবলাম, আজ থেকে যদি কথাবার্তা আরবীতে বলি, তাহলে যবান নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কারণ, অনর্গল আরবী তুমিও বলতে পার না, আমিও পারি না। সুতরাং আরবীতে বলতে গেলে যবান লাগামহীন হবে না। এভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচা সহজ হবে।'

আমাদের উপমা

তারপর হযরত মিয়াঁ সাহেব বললেন : আমাদের উপমা ওই লোকের মতো যে প্রচুর টাকা-পয়সা হাতে করে বাড়ি থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলো। গন্তব্যস্থলে পৌছার পূর্বে তার সব টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলো। এখন হাতে আছে অল্প কিছু টাকা। এ টাকা সে খুব হিসাব-নিকাশ করে চলে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া খরচ করে না। যেন কোনো রকম গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারে।'

অতঃপর তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জীবন দান করেছেন। এটা আমাদের জন্য গন্তব্যস্থলে পৌছার টাকা-পয়সা তথা পাথেয়ের মতো। অথচ আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। যদি একে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতাম, তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌছার পথ সহজ ও সুগম হতো। কিন্তু আমরা আমাদের মূল্যবান এ পুঁজিকে শেষ করে দিচ্ছি। অহেতুক

কথাবার্তায় সময় কাটাচ্ছি। গল্পের আড্ডা জমাচ্ছি। আরো বিভিন্ন অহেতুক কাজে জীবনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি। জানা নেই, আর কত দিন বাঁচবো! এখন শেষ মুহূর্তে এসে মন চায়, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোকে হিসেব করে চলি। মেপে মেপে চলি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে এমন কাজ করি।

আল্লাহ যাদেরকে এ ধরনের পবিত্র চিন্তা দান করেছেন, তাদের অবস্থা এমনই হয়। তারা ভাবে, আল্লাহ যবান দিয়েছেন, তাই এর যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এর সঠিক ব্যবহার হওয়া উচিত। গলদ স্থানে যেন এর ব্যবহার না হয়– এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়

সিদ্দীকে আকবর হযরত আবুবকর (রা.)। নবীদের পরেই তাঁর স্থান। একবার তিনি জিহ্বাকে টেনে ধরে বসে ছিলেন এবং তা মোচড়াচ্ছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : 'আপনি এমন করছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন :

'এ জিহ্বা আমাকে বড়ই বিপর্যয়ে ফেলেছে। তাই একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছি।'

অন্যত্র এসেছে, তিনি মুখে কংকর এঁটে বসেছিলেন, যেন বিনা প্রয়োজনে যবান থেকে কথা বের না হয়।

মোটকথা, যবান এমন এক বস্তু, যা মানুষকে বেহেশতও দেখাতে পারে, দোযখেও নিক্ষেপ করতে পারে। তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। যেন কোনো অযথা কথা বের না হতে পারে। এর তরিকা হলো, বেশি কথা না বলা। কারণ, যত বেশি বলবে, তত গুনাহর ফাঁদে পড়বে। এজন্য দেখা যায়, হক্কানী পীর সাহেবের কাছে ইসলাহের জন্য গেলে তিনি রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করেন। অনেকে ইসলাহের জন্য কেবল যবানের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

যবানে তালা লাগাও

এক ব্যক্তির ঘটনা। আমার আব্বা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর নিকট সে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো। কিন্তু আব্বাজানের সঙ্গে তাঁর কোনো ইসলাহী সম্পর্ক ছিলো না। কথা শুরু করলে আর থামার নামও নিতো না। এক কথা শেষ তো অন্য কথা শুরু...। আব্বাজান ধৈর্যসহ শুনতেন। লোকটি একদিন এসে আব্বাজানের নিকট দরখাস্ত পেশ করলো : 'হযরত আপনার সঙ্গে আমি ইসলাহী সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।' আব্বাজান দরখাস্ত কবুল করলেন। বললেন :

'ঠিক আছে!' এবার লোকটি বললো : 'হুযূর! আমাকে কিছু আমল-অযীফা দিন।' আব্বাজান বললেন : 'অযীফা তোমার একটাই। তুমি মুখে তালা দাও। যবানকে লাগামহীন ছেড়ে রেখো না। তাকে সংযত রাখো। এটাই তোমার আমল। এটাই তোমার অযীফা।' পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো, যবানকে সংযত রাখার মাধ্যমেই সে আত্মশুদ্ধি লাভে ধন্য হলো।

গল্প-গুজবে ব্যস্ত রাখা

আমাদের সমাজে যবানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অবলীলায় চলছে তো চলছেই– এটা খুবই মারাত্মক বিষয়। দেখা যায়, সময় পেলেই বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে গল্প-গুজবে মেতে উঠি। বলি, 'এসো, বসে একটু গল্প-গুজব করি।' গল্প চলাকালে মিথ্যা চলে, গীবত চলে। অন্যের বিদ্রূপ চলে। ফলে গল্প তো নয়; বরং অসংখ্য গুনাহ অর্জিত হয়। তাই জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। আল্লাহ রহম করুন। যবানের হিফাযতের গুরুত্ব আমাদের অন্তরে পয়দা করে দিন। আমীন।

নারীসমাজ এবং জিহ্বার অপব্যবহার

অবশ্য সকল শ্রেণীর লোকই যবানের গুনাহে লিপ্ত। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মাঝে আছে এমন আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের সন্ধান দিয়েছেন। তার মধ্য থেকে অন্যতম একটি ব্যাধি হলো, তাদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন : 'হে নারীজাতি! আমি দোযখীদের মধ্যে সবচে বেশি দোযখী তোমাদেরকে পেয়েছি। দোযখে পুরুষের চেয়ে তোমাদের সংখ্যা বেশি।' তখন মহিলাগণ প্রশ্ন করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন :

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

'তোমরা অধিক লানত কর এবং স্বামীর না-শোকরি বেশি কর।' এ কারণে দোযখে তোমাদের সংখ্যা অধিক।'

লক্ষ্য করুন, হাদীস শরীফ দ্বারা চিহ্নিত দুটি কারণ যবানের সাথে সম্পৃক্ত। বোঝা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের অন্যতম রোগ চিহ্নিত করেছেন যবানের অপব্যবহার। অর্থাৎ– অধিকাংশ মানুষ যবানকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করে। যথা কাউকে অভিসম্পাত করা, ভর্ৎসনা করা, গালি দেয়া, মন্দ বলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা– এসবই যবানের গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

জান্নাতের প্রবেশের গ্যারান্টি দিচ্ছি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি আমাকে দুটি বস্তুর নিশ্চয়তা দিবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। দুটি জিনিসের একটি হলো, দুই চোয়ালের মধ্যখানে অবস্থিত বস্তু অর্থাৎ- যবান। একে সে মন্দ কাজে ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা দিবে। এ যবানের মাধ্যমে সে মিথ্যা বলবে না, গীবত করবে না, কারো মনে কষ্ট দিবে না ইত্যাদি। আর অপরটি হলো, দুই রানের মধ্যখানে অবস্থিত বস্তু অর্থাৎ- লজ্জাস্থান। সে একে অপব্যবহার না করার গ্যারান্টি দিবে। হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে। তাহলে আমি তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। বোঝা গেলো, যবানের হেফাযত দ্বীন হেফাযতের অর্ধাংশ। দ্বীনের অর্ধাংশ যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানবজীবনের অর্ধেক গুনাহ যবানের কারণে হয়ে থাকে। তাই একে সংযত রাখতে হবে।

নাজাতের জন্য তিনটি কাজ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! নাজাতের উপায় কী?' অর্থাৎ- আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতে যাওয়ার উপায় কী? এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো, নিজের যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। তোমার জিহবা যেন কখনও তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। দ্বিতীয়টি হলো, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ- অধিকাংশ সময় ঘর-বাড়িতে কাটাবে। বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে না। তাহলে বাইরে যে সব ফিতনা আছে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

গুনাহর কারণে কাঁদো

তৃতীয় কথাটি হলো, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি করে ফেল; যদি তোমার থেকে কোনো অন্যায়-অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তা স্মরণ করে কাঁদো। কাঁদার অর্থ

হলো, তাওবা করো। অনুতপ্ত হয়ে ইসতিগফার করো। কাঁদার অর্থ হাউমাউ করে অনর্থক কাঁদা নয়। যেমন কিছু আগে আমাকে একজন বললো : হুযুর! আমার কান্না আসে না। তাই আমি খুবই চিন্তিত। আসলে চোখের পানি আসতেই হবে- এমন কোনো কথা নেই। কান্নার অর্থ হলো, গুনাহর কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং বলা হে আল্লাহ! আমি অন্যায় করেছি, আমি ভুল করেছি; আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হে যবান! আল্লাহকে ভয় করো

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُوْلُ : اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا، فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'যখন ভোর হয়, তখন মানবদেহের অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে উদ্দেশ করে বলে : হে যবান! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, আমরা তোমার অধীন। যদি তুমি ঠিক থাক, তাহলে আমরাও ঠিক থাকবো। যদি তুমি বাঁকা পথে চল তাহলে আমরা বাঁকা পথে চলবো।' অর্থাৎ- সম্পূর্ণ মানবদেহ যবানের অধীন। যবান গুনাহ করলে গোটা দেহ গুনাহের প্রতি অগ্রসর হয়। যবান ঠিক তো সব ঠিক। এজন্যই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে অনুরোধ করে, তুমি ঠিক থাকো। কারণ, তুমি অন্যায় করলে আমরা বিপর্যস্ত হবো। প্রশ্ন হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলে কীভাবে? উত্তর হলো, হয়ত সত্যি সত্যিই আল্লাহ যবানকে বাকশক্তি দান করেন, যার মাধ্যমে সে অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কথা বলে। কারণ, যবানের বাকশক্তিও তো দান করেছেন আল্লাহ তাআলা। কিয়ামত দিবসে সকল অঙ্গকে বাকশক্তি তো আল্লাহই দান করবেন। সুতরাং এখনও সেই বাক্‌শক্তি দান করা তাঁর জন্য কঠিন নয় মোটেই।

কিয়ামত দিবসে সকল অঙ্গ কথা বলবে

এককালে প্রকৃতিবাদের খুবই দাপট ছিলো। এ মতবাদের প্রবক্তা ও অনুসারীরা 'মুজিযা' ও 'কারামত' মানতো না। তারা বলতো, এগুলো প্রকৃতি পরিপন্থী। স্বাভাবিক নিয়ম এগুলোকে সাপোর্ট করে না। সুতরাং এগুলো নিছক

কল্পনা! এ ধরনের এক লোক হযরত থানবী (রহ.)কে প্রশ্ন করলো যে, 'হযরত! কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। এটা কীভাবে সম্ভব, এগুলোর তো যবান নেই? যবান ছাড়া কথা বলবে কীভাবে?' উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) পাল্টা প্রশ্ন করলেন : 'যবানের জন্য তো আরেকটি যবান নেই! তাহলে সে কীভাবে কথা বলে? যবান তো শুধু একটি গোশতের টুকরা, তবুও সে বলে যাচ্ছে। তার জন্য ভিন্ন কোনো যবান নেই। বোঝা যায়, গোশতের এ টুকরাটিকে বাক্‌শক্তি দান করেছেন আল্লাহ তাআলা। তাই সে কথা বলতে সক্ষম হচ্ছে। যদি এ বাক্‌শক্তি তিনি কেড়ে নেন, কথা বলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলবে। এ বাক্‌শক্তি আল্লাহ অন্য অঙ্গকেও দান করতে পারেন। যখন দান করবেন, তারা কথা বলা শুরু করবে।

মোটকথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে পারা হাকীকতও হতে পারে। বাস্তবেই প্রতিদিন ভোরে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে সম্বোধন করে কথা বলে। অথবা রূপক অর্থেও হতে পারে। সকল অঙ্গ যেহেতু যবানের অধীন, তাই যবানের অপব্যবহার করা যাবে না। একে সরল পথে চালনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

সারকথা, যবানের হেফাযত অবশ্যই করতে হবে। একে সংযত না রাখলে, গুনাহ হতে বিরত না রাখলে সফলতা পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। যবানের হিফাযত ও সহীহ ব্যবহার করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

“ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। এটা সাধারণ কোনো ঘটনা নয়; বরং বিশ্বমানবতা ও ধর্মসমূহের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইবাদতগৃহসমূহ নির্মাণের ইতিহাসে এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা দ্বিতীয় আরেকটি ঘটেনি। কেননা, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর নির্মিত হতে যাচ্ছে।”

হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বায়তুল্লাহর নির্মাণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (اَلْبَقَرَة : ١٢٧ - ١٢٩)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সম্মানিত সুধী!

আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত মাহফিলে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। এ সুবাদে আমাকে বলা হয়েছে কিছু আলোচনা রাখার জন্যে। আলহামদুলিল্লাহ এ পবিত্র মাহফিলে অনেক মহান ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা ইলম ও আমলে, তাকওয়া ও পরহেজগারীতে আমার চেয়েও মহান। তাঁদের সামনে মুখ নাড়ানো একপ্রকার দুঃসাহসিকতা। কিন্তু যেহেতু বড়দের মুখে শুনেছি, বড়রা কোনো নির্দেশ করলে সাথে সাথে পালন করতে হয়, তাই আজ বড়দের উপস্থিতিতেই একটি মুশকিল কাজ সম্পাদন করতে যাচ্ছি। আপনাদের

সামনে দু'-চারটি কথা বলার জন্য বসেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি তাঁর সন্তুষ্টিমাফিক কিছু কথা বলার তাওফীক দেন এবং তা থেকে আমাকে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

দ্বীনের পূর্ণতা

ভাবছি, এ মুহূর্তে দ্বীনের কোন কথাটি আপনাদের সম্মুখে পেশ করবো। যেহেতু আমরা যে দ্বীনের অনুসারী, সেই দ্বীন তার প্রতিটি দিক পরিপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। এর জন্য আলাদা সময়েরও প্রয়োজন। কবির ভাষায়–

زفرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگرم

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جا است

'দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের অবস্থা হলো, যে বিষয়টির প্রতিই তাকাই, মনে হয় তাকেই আলোচনার বিষয়বস্তু বানাই।' তাই বুঝে উঠতে পারছি না যে, আপনাদের সামনে কোন বিষয়ে আলোচনা করবো।

তবে মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে এই আজীমুশ্বান সুযোগ পেয়ে আমার মনে হলো, মসজিদের নির্মাণ উপলক্ষ্যে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো, যে আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআলা মানবতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরেছেন।

বায়তুল্লাহ নির্মাণের ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) আপন সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)কে সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। অত্যন্ত চমৎকার, বিস্ময়কর ও মনোহারী ভঙ্গিতে এ ঘটনাটিকে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা এ ঘটনাকে কুরআন মজীদের অংশে পরিণত করেছেন। এর মাধ্যমে ঘটনাটিকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য সংরক্ষিত করেছেন। প্রকারান্তরে বারবার স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমার ইচ্ছা হলো, আজকের এ মাহফিলে আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর এবং দুআর সংক্ষিপ্ত তাফসীল আপনাদের খেদমতে পেশ করবো। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারাতে রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন–

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ

'স্মরণ করো, যখন হযরত ইবরাহীম কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো এবং তার সাথে ইসমাঈলও ছিলো।'

আয়াতে اِذْ শব্দ রয়েছে। এটি আরবী ভাষায় বর্ণনার একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সামনে যে কথাটা বলা হবে, তা সব সময় বরং প্রতিদিন স্মরণযোগ্য।

আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ যদিও অনেক আগ থেকে ছিলো, তার ভিত্তিও মওজুদ ছিলো। হযরত আদম থেকে এ পর্যন্ত এটি এভাবেই পড়ে ছিলো। কালপ্রবাহে তার ইমারত নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ– ভিত্তি ছিলো; ইমারত ছিলো না। হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্বের এ ভিত্তির উপর বায়তুল্লাহ শরীফের পুনঃনির্মাণ করলেন। এ কাজে তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আ.)ও ছিলেন।

যৌথ কাজকে বড়দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিলো, প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াত বিশেষ কোনো স্থান নজরে পড়লে থেমে যেতেন, ফিকির করতেন। আমাদের কেউ তাঁর কাছে থাকলে অথবা তাঁর কোনো খাদেম থাকলে তেলাওয়াতকালে যে কথা মনে পড়েছে সে কথা শুনিয়ে দিতেন। একদিন তিনি যথারীতি তেলাওয়াত করছিলেন। আমি পাশে বসা ছিলাম। যখন তিনি وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ এ আয়াতটিতে পৌছলেন, তখন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন এবং আমাকে বললেন : দেখো, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এভাবেও তো বলতে পারতেন–

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ وَاِسْمٰعِیْلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ

অর্থাৎ– 'ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়ে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছিলো।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেননি। বরং আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ.)-এর নাম নিলেন এবং বাক্য পরিপূর্ণ করে দিলেন। তিনি এভাবে বললেন : 'ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছিলো এবং ইসমাঈল (আ.)ও।' অর্থাৎ– ইসমাঈল (আ.)-এর কথা উল্লেখ করলেন পরে। আর ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করলেন আগে। আব্বাজান বলেন : হযরত ইসমাঈল (আ.)ও তো বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন সমভাবে। তিনি পাথর এনে দিতেন আর ইবরাহীম (আ.) সেটা গাঁথতেন।

এভাবে তাঁরা উভয়ে মিলে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও কুরআন মাজীদ কাজটির সম্বন্ধ সরাসরি ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে করলো।

এরপর আব্বাজান বলেন : মূলত ব্যাপার হলো, এটাই ছিলো আদবের দাবি। আদবের দাবি হলো, বড় এবং ছোট মিলে যৌথভাবে কোনো কাজ করলে সেই কাজটির সরাসরি সম্বন্ধ করা হয় বড়র দিকে। আর 'ছোট'র সম্পর্কে বলা হয়, কাজটিতে সেও অংশগ্রহণ করেছিলো। 'ছোট' এবং 'বড়'কে একই পর্যায়ভুক্ত করে কাজে নিসবত সমভাবে উভয়ের দিকে করা আদবের পরিপন্থী।

হযরত উমর (রা.) ও আদব

কথাটিকে বোঝানোর জন্য আব্বাজান একটা উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন : হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো ইশার নামাযের পর কোনো কাজ করতেন না। বরং তিনি বলতেন : ইশার পরে গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে যাওয়া এবং অযথা কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটা এজন্য যে, যেন ফজরের নামাযে ধীরে-সুস্থে আদায় করা যায়। তারপর হযরত উমর (রা.) বলেন : মাঝে-মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অভ্যাসের ব্যতিক্রমও হতো। কারণ, মাঝে মধ্যে তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করতেন। আর আমিও তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

আব্বাজান বলেন : এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ঘটনাটি বর্ণনাকালে হযরত উমর ফারূক (রা.) একথা বলেননি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে এবং আবু বকর (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করতেন। বরং তিনি বলেছেন : আবু বকর (রা.) সাথে পরামর্শ করতেন আর আমিও তাঁর সাথে থাকতাম। এটাই হলো ছোটদের আদব। ছোটরা বড়দের সাথে কোনো কাজ করলে 'আমি করেছি' একথা সরাসরি বলে না। বরং কাজের সম্পর্ক বড়দের সাথে করে বলে, আমিও সাথে ছিলাম।

কুরআন মাজীদও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছে আর ইসমাঈল (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এখানে বায়তুল্লাহর নির্মাণের বিষয়টি সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা

যাক, এখানে আমাদের বুঝবার বিষয় হলো, ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। এটা সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। বরং বিশ্বমানবতা ও

আসমানী ধর্মসমূহের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইবাদতগৃহগুলোর নির্মাণের ইতিহাসে এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা দ্বিতীয় আরেকটি ঘটেনি। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণের এই ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক বিষয় এখানে বলা যেতো। যেমন নির্মাণের পাথরগুলো কোত্থেকে নেয়া হয়েছিলো? মাল-মশলা কোথায় স্তূপ দেয়া হয়েছিলো? পাথরগুলো কে উঠিয়ে দিয়েছিলো? চুনকাম কে করেছিলো? কত ফুট উঁচু করে গৃহটি নির্মাণ করা হয়েছিলো? তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কতটুকু ছিলো? নির্মাণে কত সময় লেগেছিলো? কত টাকা বাজেট ছিলো? পৃথিবীর এ শ্রেষ্ঠ ঘর বিনির্মাণে এসব কিছুই ছিলো উল্লেখযোগ্য এককেটি অধ্যায়। কিন্তু কুরআন মজীদ এ সবের কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। শুধু ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে : যখন ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করছিলো।

এরপর কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ.) যখন বায়তুল্লাহ নির্মাণ করছিরেন, ওই সময় তাঁর পবিত্র যবান থেকে কোন দুআটি উচ্চারিত হয়েছিলো? আল্লাহর দরবারে তিনি তখন কী প্রার্থনা করেছিলেন? বোঝা গেলো, ইতিহাসের ওই সকল অধ্যায়ের তুলনায় দুআর বিষয়টি এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ওসব কাজের চেয়েও ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ আল্লাহ তাআলার অধিক পছন্দনীয়। যার কারণে তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর দুআকে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের অংশ হিসেবে পরিণত করেছেন। আল্লাহ বলেন : বায়তুল্লাহর নির্মাণ কালে ইবরাহীম (আ.) এ দুআটি করেছিলো-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'পরওয়ারদেগার! আপনি দয়া করে আমাদের থেকে এ খেদমতটুকু কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি উত্তম শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।'

এক মহান কাজ সম্পাদন করছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর– যা সর্বশেষও; নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। মানবতার ইতিহাসে যা হবে এক মহা আকর্ষণ। যা হবে মানবেতিহাসের বলিষ্ঠ তীর্থস্থান। যার দিকে মানুষ অজানা এক মুগ্ধতায় তাকিয়ে থাকবে, যেয়ারত করবে। যেখানে মানুষ ইবাদত করবে। সেই বায়তুল্লাহ, যার ভিত্তিমূল মাটির বুকে হারিয়ে গেছে। ইবরাহীম (আ.) তা উদ্ধার করে পুনরায় নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। এত বড় কাজ তিনি করছেন। অথচ তাঁর যবানে ও হৃদয়ে অহঙ্কারের কোনো চিহ্ন নেই। কোনো নাজ নেই, ফখর নেই। মানুষকে চমকে দেয়ার ছলনা নেই। মস্তক তাঁর অবনত। হৃদয় তাঁর বিগলিত। আল্লাহকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে, হে আল্লাহ! আমার নগণ্য

আমলটি তো আপনার দরবারে কবুলযোগ্য নয়। কিন্তু যদি আপনার দয়া হয়, মায়া হয়, তাহলে কবুল করুন।

গর্ব করা যাবে না

এ দুআটির মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা। সে যত বড় কাজই করুক, তার খেদমত যত বড় হোক, অন্তর থাকতে হবে অহঙ্কারমুক্ত। অনেক বড় কাজ করছি, দ্বীনের এক মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি– এরূপ কোনো ভাবনা তার অন্তরে থাকতে পারবে না, বরং তার হৃদয় থাকতে হবে কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত। তবেই তার ভাবনা হবে উন্নত। তার চেতনা এভাবে জাগ্রত থাকবে যে, হে আল্লাহ! আমার কাজটি তো অধম। কারণ, আমি নিজেই অক্ষম। অক্ষম মানুষ আপনার মতো কাজ করতে পারে না। বিধায় আমার কাজটি আপনার শাহী দরবারে কবুলযোগ্য হতে পারে না। তবুও দয়া করে আপনি কবুল করুন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়ার স্রোতের বিরুদ্ধে ভিন্ন পথ রচনা করে উম্মাহকে এই শিক্ষা দিলেন যে, দুনিয়ার রীতি হলো, কাজ যত বড় হবে, নফসের লাফালাফিও তত বেশি হবে। নফস বলবে, অনেক বড় কাজ! সুতরাং সাজ সাজ রবে সামনে চলো। নিজেকে মহান দাবি করো। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শিক্ষা ভিন্ন। তিনি নতুন সুন্নাত রেখে গেলেন। মানুষকে শিক্ষা দিলেন যে, নেক কাজ করে বড়াই করো না। বড়াই করলে আমলে কোনো কাজ হবে না। আমল তখন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই নেক কাজ করার পর ভাববে, যে পর্যায়ের আমল করার দরকার ছিলো, সেই মানের আমল যে করতে পারিনি! আল্লাহর কাছে এ আমল গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা তিনিই জানেন। হে আল্লাহ! আপনি রহম করুন, আমার আমলটি কবুল করে নিন।

মক্কাবিজয় এবং বিশ্বনবী (সা.)-এর বিনয়

মক্কাবিজয় ইতিহাসের এক মহান বিজয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ একুশ বছরের প্রচেষ্টার ফল এ বিজয়। যে মক্কার মানুষের তুনীরে এমন কোনো তীর ছিলো না, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়নি। ষড়যন্ত্রের প্রতিটি ঘাঁটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ছিলো সক্রিয়। জুলুম-জিঘাংসার এমন কোনো অধ্যায় নেই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহ্য করতে হয়নি। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই বাণী যে-ই পাঠ করেছে, সে-ই তাদের কোপানলে পড়েছে। এমনকি মক্কাবাসীরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছে। সেই ঐতিহাসিক মক্কায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

আজ প্রবেশ করছেন বিজয়ী হিসেবে। মক্কার বেদনাবিধুর অতীত কথা বারবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। যদি অন্য কোনো বিজয়ী হতো, তাহলে তার বুক এই মুহূর্তে গর্বে টানটান থাকতো। গরদান উঁচু থাকতো। বিজয়ের উল্লাসধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হতো। মক্কার অলিতে-গলিতে রক্তের বন্যা বয়ে যেতো। অন্য কোনো বিজয়ী হলে এ মুহূর্তে এভাবেই মক্কায় প্রবেশ করতো। অথচ বিশ্বের রহমত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কেমন ছিলো? হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষায় শুনুন। তিনি বলেন : আমার স্মৃতির ঝুলিতে আজও জ্বলজ্বল করছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা বিজয়ের দৃশ্য। মক্কায় তিনি মাআল্লার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। 'কাসওয়া' নামক একটি উটনীর পিঠে বসা ছিলেন। তাঁর গরদান ছিলো এতই অবনত যে, থুতনি বুক ছুঁয়ে গিয়েছিলো। চক্ষু ছিলো অশ্রুবিগলিত। আর যবানে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হচ্ছিলো–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (سُوْرَةُ الْفَتْحِ : ١)

হে আল্লাহ! আজকের এ বিজয় আমার বাহুবলে অর্জিত হয়নি। এ বিজয় তো আপনার দয়ায় হয়েছে। এটা আপনার ফযল ও করমে সম্ভব হয়েছে। আমি বিজয়ীবেশে প্রবেশ করছি কেবল আপনার করুণার বদৌলতে। এটা আপনার নুসরত, আমার কুওয়ত নয়।

এটাই ছিলো নবীদের সুন্নাত। এটাই আমাদের নবীর সুন্নাত এবং ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত যে, বিজয়ীর শান হলো, গরদান ঝুঁকে যাবে এবং বুকের সাথে লেগে যাবে।

তাওফীক আল্লাহর দান

কোনো আমল করার সুযোগ হলে মনে রাখবে, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি তাওফীক না দিলে তুমি করতে পারতে না। এটা তো তাঁরই দয়া যে, তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন।

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی

منت شناس کہ اورا بخدمت گذاشت

লম্বা নামায পড়েছি– এই খোঁটা দেয়ার স্থান এটা নয়। অনেক রোযা রেখেছি, যিকির করেছি, বড় বড় ইবাদত করেছি, দ্বীনের বিশাল খেদমত করেছি, বিশাল বিশাল গ্রন্থ লিখেছি, তেজোদীপ্ত আলোচনা করেছি এবং অসংখ্য ফতওয়া

লিখেছি– এসব গর্বের বিষয়ই নয়। বরং এসব আল্লাহর বিশেষ দয়া। তিনি ইচ্ছা করলে একটা সরিষাকেও কাজে লাগাতে পারেন। সুতরাং এগুলো কোনো বড়াইর বিষয় নয়। বরং দুআ করো, তিনি যেন নেক আমল করার তাওফীক দেন। বান্দার সর্বপ্রথম কাজ হলো, নেককাজ করে আল্লাহর শোকর আদায় করা। আল্লাহ যেন কবুল করেন, এই দুআ করা। সামান্য আমল করে তা নিয়ে গর্ব করে বেড়ানো ছোট মানসিকতার পরিচয়। আরবী প্রবাদ আছে–

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْىَ

'এক তাঁতী ভুলে-চক্করে একবার দু' রাকাত নামায পড়লো। তারপরই বসে বসে অহীর অপেক্ষা করতে লাগলো।' তাঁতী বেচারা ভেবেছে, দু' রাকাত নামায পড়ে বিশাল কাজ করে ফেলেছি। নবুয়ত পাওয়ার যোগ্য কাজ আমার দু' রাকাত নামায। তাই সে অহীর অপেক্ষায় বসে আছে। আসলে এটা ছোট মানুষের পরিচয়। পাত্র ছোট, তাই মনও ছোট। তাঁতীর কাজটি এটারই প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহর প্রকৃত বান্দা যে, সে তো আল্লাহকে ভয় করে। কাজও করে, সাথে সাথে আল্লাহকেও ভয় করে। ভাবে, আমার কাজ তো আল্লাহর শানের অনুকূলে নয়। অতএব হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি কবুল করুন।

বলছিলাম ইবরাহীম (আ.)-এর কথা, তাঁর বিনয়ের কথা, তাঁর বান্দাসুলভ আচরণের কথা। তাঁর দুআর কথা। তিনি কাবাগৃহ নির্মাণ করছেন। ইতিহাসের সবচে আজীমুশ্বান কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। অথচ তাঁর মাঝে কোনো অহঙ্কার নেই, গর্ব নেই, লোক দেখানোর কোনো চালাকি নেই।

কে প্রকৃত মুসলমান?

দুআর দ্বিতীয় অংশটিও বিস্ময়কর। কাবাগৃহ নির্মাণকালে দুআর দ্বিতীয় ভাগে তিনি বলেছিলেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

'পরওয়ারদেগার! আমাদের দু'জনকে তথা আমাকে ও আমার সন্তান ইসমাঈলকে মুসলমান বানান।'

আশ্চর্য দুআ! তাঁরা কি মুসলমান ছিলেন না? হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল মুসলমান না হলে দুনিয়ায় এমন কে আছে, যে মুসলমান? আসল ব্যাপার হলো, আরবী ভাষায় 'মুসলিম' শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ, অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ– তিনি দুআ করেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার ছেলেকে আপনার অনুগত করে দিন। যেন আপনার বিধানমতে কাটাতে

পারি আমাদের গোটা জীবন। একজন মানুষ যখন পড়ে– أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ। তখন সে সত্তর বছরের কাফের হলেও মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু কেবল কালিমা তাইয়েবা পড়ে নেয়াই মুমিনের কাজ নয়। বরং একজন মুমিন কালিমা পাঠ করার পর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে অর্পণ করে দেয়। এছাড়া সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। তাই কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।'

এ আয়াতে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। অর্থাৎ– ঈমান আনা হলো একটা আমল। তারপর ইসলামে প্রবেশ করা দ্বিতীয় আরেকটি আমল। আর ইসলামের অর্থ হলো, নিজের পুরো জীবনকে, নিজের উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও চিন্তাধারাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়া। এটা করতে পারলে ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দুআই করলেন যে, পরওয়ারদেগার! আমাকে এবং আমার ছেলেকে আপনার আজ্ঞাবহ করে দিন।

মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য

এ প্রসঙ্গে আমি কেবল একটি কথার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাহলো আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম মসজিদ নির্মাণ করেছেন, বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছেন। একটি মহান কাজ করেছেন। কিন্তু মূলত মসজিদ নির্মাণ মৌলিক কোনো উদ্দেশ্য নয়। বরং মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য একটি প্রতীক। মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, জীবনকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া। মসজিদ নির্মাণের পরও যদি আল্লাহর আজ্ঞাবহ বান্দা না হওয়া যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হবে। তখন নিছক মসজিদ নির্মাণ হবে। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করাই হলো আসল বিষয়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআতেও একথাই ফুটে উঠেছে। তিনি দুআ করেছিলেন আজ্ঞাবহ বান্দা হওয়ার। তথা আল্লাহর হুকুমমাফিক জীবন পরিচালিত করার। আয়াতের 'মুসলিম' শব্দের অর্থ একথার প্রতি ইঙ্গিতবহ। মসজিদ নির্মাণ করলাম; অথচ আল্লাহর অনুগত বান্দা হলাম না। তাহলে কেমন যেন নিম্নোক্ত কবিতাটির প্রতিপাদ্য বস্তুতে পরিণত হলাম।

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

আলীশান মসজিদ নির্মিত হয়েছে; কিন্তু নামাযী নেই, যিকিরকারী নেই। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। যদি অবস্থা এমনই হয়, তাহলে শেষ যামানার মসজিদ সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেছেন–

عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ

চমৎকার মসজিদ হবে, আকর্ষণীয় ডিজাইন হবে; অথচ মসজিদ হবে মুসল্লী শূন্য। মসজিদ হাহাকার করবে, অথচ নির্মাণে প্রস্ফুটিত থাকবে বিভিন্ন কারুকার্য।

শুধু নামায-রোযার নাম দ্বীন নয়

কিছু লোকের ধারণা, মুসলমানিত্ব মানে নামায পড়া, দৈনিক পাঁচবার মসজিদে হাজির হওয়া, রোযা রাখা আর যাকাত আদায় করা। এসব ইবাদত যে পালন করবে, সে-ই মুসলমান হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উল্লিখিত দুআর মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মসজিদ নির্মাণ করা, মসজিদে গমন করা, নামায পড়া, যিকির করা– এসব অবশ্যই দ্বীনের অংশ। তাই বলে কেবল এগুলোই দ্বীন নয়। দ্বীন আরো ব্যাপক। শুধু এগুলো পালন করে দ্বীনের অন্যান্য দিককে উপেক্ষা করা যাবে না। বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, যতক্ষণ মসজিদে থাকি, ততক্ষণ মুসলমান থাকি। নামায পড়ি, যিকির করি, ইবাদত করি। আর মসজিদ থেকে বের হয়ে যখন বাজারে যাই, তখন মুসলমানিত্ব ভুলে বসি। তখন দ্বীনের তোয়াক্কা করি না। অফিসের চেয়ারে বসলে দ্বীনের কথা আর খেয়াল থাকে না। রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বীনের কোনো গুরুত্ব দিই না। মসজিদে গেলে মুসলমান আর মসজিদ থেকে বের হলে নাফরমান। মনে রাখবেন, শুধু নামায-রোযার নামই দ্বীন নয়। দ্বীন মূলত পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টি। আকাঈদ, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক– এ পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টি হলো ইসলাম। মসজিদে গিয়ে মুসলমান সাজলাম আর আল্লাহ না করুন বাড়িতে গিয়ে কুফরের কাজ করলাম, তাহলে আসলেই কি আমি মুসলমান? মুসলমান হলে পাক্কা মুসলমান হতে হবে। এইজন্যই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'হে ঈমানদারগণ! ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো।'

মসজিদে গেলাম, ইবাদত করলাম; অথচ লেনদেনে খারাপ করলাম, শিষ্টাচারে অভদ্রতা দেখালাম, চরিত্রে অসভ্যতার তুড়ি বাজালাম! সুতরাং আমি কি প্রকৃত মুসলমান হলাম?

মসজিদের অনেক হক রয়েছে। তন্মধ্যে এটাও আছে যে, মসজিদে যে আল্লাহর সিজদা করা হবে, সে আল্লাহর হুকুম বাজারে গিয়েও পালন করতে হবে। মসজিদে নামায পড়ে বাজারে সুদের কারবার করা যাবে না। তখন লেনদেন, শিষ্টাচার, চরিত্রসহ সবকিছুই হতে হবে ইসলামের আদলে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর মালফূযাতে এসব বিষয় বারবার আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইবাদতের মতো লেনদেন স্বচ্ছ রাখাও অপরিহার্য বিষয়। শিষ্টাচার ও চরিত্র পবিত্র রাখা অপরিহার্য। এগুলো নামায-রোযার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল নামায-রোযাকে দ্বীন মনে করে এসব বিষয়কে উপেক্ষা করা যাবে না।

ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া ওয়াজিব

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরবর্তী বাক্য ছিলো–

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

'আমার অনাগত বংশধরকেও আপনি মুসলমান বানান। অর্থাৎ– আমার ভবিষ্যত বংশধরকে আপনার আজ্ঞাবহ করে সৃষ্টি করুন।'

দুআর এ অংশে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলমান কেবল নিজে মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না। নিজে মুসলমান হলেই তার যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায় না। বরং তার দায়িত্ব আরও অনেক। তাকে তার সন্তান-সন্ততিরও ফিকির করতে হবে। আজকাল আমাদের মধ্যে এমন মুসলমানও আছে, যিনি নিজে তো পাকা নামাযী, মসজিদের প্রথম কাতারের মুসল্লী, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারী; অথচ সন্তানরা বিপথগামী। তিনি তাদের জন্য একটু ব্যথিতও হন না যে, তারা কোথায় যাচ্ছে। তারা নাস্তিকতার পথ ধরেছে, বদদ্বীনের জোয়ারে ভাসছে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার তালে আছে, জাহান্নামের আগুনে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অথচ এ ব্যক্তির মনে কোনো ব্যথা নেই, দরদ নেই, সন্তানদের বাঁচানোর ফিকির নেই। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃত মুসলমান কখনও নিজের হেদায়াতপ্রাপ্তির উপর আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকে না। বরং তার মনে অন্যকে হেদায়াতের পথে আনার ব্যথা থাকে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।'

নিজের যেমনিভাবে দোযখের আগুন থেকে বাঁচতে হবে, অনুরূপভাবে ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনকেও দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। এটাও ফরয।

দুআর মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) তারপর বলেছেন–

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

এখানে হযরত ইবরাহীম এ দুআ করেননি যে, হে আল্লাহ! আমাদের এ আমলের বিনিময় দান করুন। কারণ, তাঁর মনে ছিলো, আমার আমল তো বিনিময় পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং আশঙ্কা রয়েছে, আমার আমলে ত্রুটি ছিলো। ফলে হতে পারে আমল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরওয়ারদেগার! যদি এ জাতীয় কিছু হয়, তাহলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের তাওবা কবুল করুন।

এটাও আমলের জন্য তাওফীক প্রার্থনা করার একটা অংশ। আমল করে সর্বপ্রথম কবুলিয়াতের দুআ করবে। তারপর ইস্তিগফার করে বলবে, হে আল্লাহ! আমলটিতে যেসব ত্রুটি হয়েছে, সেগুলো দয়া করে মাফ করে দিন। এভাবে করাটাই একজন ঈমানদারের কাজ।

নামাযের পরে ইস্তিগফার কেন?

হাদীস শরীফে এসেছে, নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়তেন। নামাযের পর ইসতিগফার পড়াটা বোধগম্য নয়। কারণ, ইসতিগফার তো হয় গুনাহ করার পর। আর নামায তো ইবাদত; গুনাহ নয়। তাহলে নামাযের পর ইসতিগফার কেন? মূলত ব্যাপার হলো, বান্দা নামায আদায় করলেও আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের তুলনায় সেই নামায নিতান্তই গৌণ। অতএব–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার বন্দেগীর হক যথাযথভাবে আমরা আদায় করতে পারিনি।' এইজন্যই নামাযের পর ইসতিগফার পড়া হয়। যেন ইবাদত পালন করতে গিয়ে যেসব ত্রুটি হয়েছে, সেগুলো আল্লাহ দয়া করে মাফ করে দেন। কুরআন মাজীদেও নেক বান্দার প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আল্লাহর বান্দা তারা, যারা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, প্রায় পুরো রাত ইবাদতে কাটায়। নামায পড়ে, দুআ করে, কান্নাকাটি করে– এভাবে সম্পূর্ণ রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর যখন ভোর হয়, তখন ইসতিগফার পড়তে থাকে।

হযরত আয়েশা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন : হে আল্লাহর রাসূল! সারা রাত ইবাদত করার পর ইসতিগফার করা এটা কেমন ইসতিগফার? সেতো কোনো গুনাহ করেনি, তাহলে এটা কি ধরনের ইসতিগফার? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন : এটা মূলত এই ইসতিগফার যে, হে আল্লাহ! রাতের বেলা যে ইবাদত করেছি, সেটা মূলত আপনার দরবারে পেশ করার যোগ্য নয়। তাই আমার ত্রুটিসমূহ থেকে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। যেসব ত্রুটি আমার ইবাদতের মধ্যে হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে দিন। এজন্যই এই ইসতিগফার। অর্থাৎ– নেক আমল করার পর 'অনেক কিছু করে ফেলেছি' ভাব মনে আনা যাবে না। বরং ইসতিগফার করতে হবে, শোকর আদায় করতে হবে। কবুলিয়াতের দুআ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে হাকীকত বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পূর্ণাঙ্গ দুআ

উল্লিখিত দুআশেষে হযরত ইবরাহীম (আ.) আরেকটি জবরদস্ত দুআ করেছেন যে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ

পরওয়ারদেগার! এ কাবা নির্মাণই যথেষ্ট নয়। বরং হে আল্লাহ! কাবা শরীফের আশেপাশে যারা থাকবে, আপনি দয়া করে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন– যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে আমল ও চরিত্র ইত্যাদির দিক থেকে পবিত্র করবেন।

বায়তুল্লাহ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দুআটি করে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল্লাহর ঘর ও আল্লাহর মসজিদ বারবার নির্মাণ করা হলেও সেগুলোর পরিপূর্ণ সফলতার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অপরিহার্য। তাঁর শিক্ষা ছাড়া শুধু নির্মাণে সফলতা পাওয়া যাবে না। এ দুআর মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তেলাওয়াত একটা আলাদা বিষয়। শুধু তেলাওয়াতেও সওয়াব রয়েছে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াতের পাশাপাশি কিতাবও শিক্ষা দেন।

কুরআনের জন্য প্রয়োজন হাদীসের নূর

আরও ইঙ্গিত রয়েছে একথার প্রতি যে, কুরআন শুধু স্টাডির মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায় না। আজকাল নিজে নিজে স্টাডি করে কুরআন বুঝার প্রচলন শুরু হয়েছে। এ আয়াতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, বসে বসে স্টাডি করলে কুরআন শেখা হয়ে যায় না। বরং কুরআন বুঝার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলো লাগবে। তাঁর শিক্ষা ছাড়া কুরআন স্টাডি যথার্থ নয়। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

যেমন আপনার কাছে কিতাব আছে; কিন্তু আলো নেই। তাহলে কিতাব দ্বারা ফায়দা নেয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন : অনুরূপভাবে তোমাদের কাছে আমি কিতাব পাঠিয়েছি এবং কিতাব বুঝবার জন্য আলোও পাঠিয়েছি। সেই আলো হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলো। তাঁর শিক্ষার আলোকে কুরআন পড়ো, তাহলে সফলতা পাবে। তাঁর শিক্ষার আলো ছাড়া কেউ কুরআন বুঝবার চেষ্টা করা মানে অন্ধকারে কিতাব পড়ার চেষ্টা করা।

অবশেষে বলা হয়েছে, প্রেরিত সেই পয়গম্বর মানুষদেরকে শুধু কিতাবই শিক্ষা দিবেন না। বরং এর সাথে সাথে তাদেরকে অসৎ চরিত্র ও বদ-আমল থেকেও পবিত্র করে দিবেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো, শুধু মৌখিক শিক্ষাও যথেষ্ট নয়। মৌখিক শিক্ষার সঙ্গে থাকতে হবে তরবিয়ত ও সুহবত। এগুলো না থাকলে বস্তুত মানুষ সফলতা ও পরিশুদ্ধতার পথ খুঁজে পাবে না।

যাক, এ ছিলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআর কিছুটা ব্যাখ্যা। এর মধ্যে পুরো দ্বীনের কথা চলে এসেছে। দ্বীনের প্রতিটি বিষয় তাঁর দুআতে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। দ্বীনের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণে বরকত দান করুন। আমাদেরকে মসজিদের হকসমূহ আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বর্তমানে আমাদের সমাজ ও পরিবেশে সবচে বেশি অবহেলার বস্তু হলো সময়। যেমন-তেমন করে শেষ করে দিচ্ছি আমাদের সময়। গল্প-গুজব, আড্ডা এবং বেহুদা কাজে ব্যয় হচ্ছে আমাদের সময়। সময়কে এমন কাজে হত্যা করা হচ্ছে, যে কাজে না আছে আখেরাতের ফায়দা, না আছে দুনিয়ার মুনাফা। দোহাই লাগে, জীবনের এ পদ্ধতি বর্জন করুন। প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগান।

সময়ের মূল্য দাও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ)

দুটি মহান নেয়ামত এবং এ থেকে গাফলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর মহান দুটি নেয়ামত আছে। অনেকে এ ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে আছে। তার মধ্যে থেকে একটি নেয়ামত হলো সুস্থতা। অপর নেয়ামত হলো অবসরতা। এ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ ধোঁকায় পড়ে থাকে। মনে করে, এগুলো আজীবন নিকটে থাকবে। সুস্থাবস্থায় কল্পনায় আসে না যে, সে অসুস্থ হবে। রোগ-ব্যাধি তাকে আক্রমণ করবে। কিংবা অবসর মানুষ এ কল্পনা করে না যে, সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে। বিধায় আল্লাহ যখন তাকে সুস্থ রাখেন, অবকাশ দেন, তখন হেলাফেলায় চলে যায় তার সময়। ধোঁকার মাঝে জীবন কাটিয়ে দেয়। নেক কাজ নিয়ে টালবাহানা করে। অলসতা করে। তার ধারণা যে, এখন অনেক সময় বাকি। অতএব নেক কাজ এখন রাখি। ফলে সে পায় না কোনো আত্মশুদ্ধি। নিজেকে শুধরে নেয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলে সে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হলো, এসব নেয়ামতের কদর করো। নিয়ামতগুলোকে কাজে লাগাও।

সুস্থতার কদর করো

সুস্থতার নেয়ামত এখন তোমার কাছে বর্তমান। জানা নেই, এগুলো তোমার কাছে থাকবে কত দিন। কখন অসুখ এসে হানা দেবে, কখন তুমি রুগ্ন হয়ে

পড়বে, তার কিছুই তোমার জানা নেই। পরবর্তীতে সুযোগ হয়ে উঠবে কিনা এটাও তোমার অজানা। সুতরাং ভালো কাজ, নিজেকে সংশোধন করার কাজ, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়ার কাজ, আখেরাতের কাজ চটজলদি করে নাও। পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।

অসুস্থ হবে, পীড়িত হবে, বিনা নোটিশে সে তোমাকে আক্রমণ করবে। তুমি হয়ে পড়বে পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ মাফ করুন, কালকের সুস্থ, আজকে অসুস্থ। চলাফেরার ক্ষমতা নেই। হয়ত সুস্থ হওয়ারও অবকাশ নেই। সুতরাং সময় নিয়ে আর নয় অবহেলা। আর তাকে নষ্ট করো না, তার মূল্য দাও। যে নেক কাজ করতে চাও, এখনই করে নাও। সুস্থতা আল্লাহর দান। এটাকে এ জগতে কাজে লাগাবে, মৃত্যুর পর তার ফল ভোগ করবে। এটাই তো আল্লাহ চান। যদি তুমি আল্লাহর এ দানের মূল্য না দাও, তাহলে একদিন মাথায় হাত দেবে। যদি তাকে খেল-তামাশায় শেষ করে দাও, তাহলে একদিন আফসোস করবে। হায় আফসোস করে করে কান্নাকাটি করবে। কিন্তু তখন তো আর কোনো কাজ হবে না। তাই সময় থাকতে এ দুটি নেয়ামতের কদর করো।

শুধু একটি হাদীস, আমলের জন্য যা যথেষ্ট। আলোচ্য হাদীসের অর্থেও রয়েছে ব্যাপকতা। কারণ, এটা 'জামিউল কালিম'-এর শ্রেণীভুক্ত। যার সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মন্তব্য সবিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন : নবীজির কিছু হাদীস আছে, মানুষের পরকালীন সফলতার জন্য যেগুলোর উপর আমল করলেই যথেষ্ট হবে। হাতেগোনা কয়েকটি হাদীস জামিউল কালিম-এর অন্তর্ভুক্ত। শব্দ কম অর্থ ব্যাপক এরই নাম জামিউল কালিম। আলোচ্য হাদীসটিও এই একই শ্রেণীর। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) তাঁর 'কিতাবুয যুহদি ওয়াররিফাক' গ্রন্থটির শুরুতেই এ হাদীসটি এনেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.)ও সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাক অধ্যায়-এ হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন। কারণ, হাদীসটির মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাগত বিপদ থেকে সতর্ক করেছেন। যেন মানুষ ঠিক হয়ে যায়, নিজেকে যেন পরিশীলিত রাখে। যখন সমস্যা ঘাড়ের উপর চলে আসে তখন আত্মশুদ্ধির যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন মানুষ সতর্কও হতে চায়। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। তাই আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি আমাদের জন্য মা-বাবার চেয়েও বেশি দয়ালু। যিনি আমাদের আত্মিক ব্যাধিসমূহের ব্যাপারে সম্যক অবগত। তিনি বলেছেন : লক্ষ্য করো, বর্তমানে তোমরা সুস্থ। হাতে তোমাদের অনেক সময়। জানা নেই, পরবর্তী সময়ে এগুলো থাকে কিনা। কাজেই সময় থাকতে সুযোগকে কাজে লাগাও, নিয়ামতগুলোর মূল্যায়ন করো।

এখন তো যুবক, শয়তানী ধোঁকা

'এখনও যুবক' এ এক আত্মপ্রবঞ্চনা। এখনও হাতে অনেক সময়, খাও দাও ফূর্তি করো, এই তো দুনিয়া। সময়-সুযোগ হলে আল্লাহর দিকে ফিরবো, নিজেকে পরিশীলিত করার চিন্তা করবো– এ জাতীয় ভাবনা মূলত নফসের ধোঁকা। এ ধোঁকার জালে মানুষ আটকা পড়ে ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হলো, যা করা দরকার তা এখনই করো। শয়তান এবং নফসের ধোঁকায় পড়ো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা যা দান করেছেন, তা অনেক মূল্যবান সম্পদ। জীবনের মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্ত অনেক বড় দৌলত। একে নষ্ট করো না। আখেরাতের জন্য কাজে লাগাও।

আমি কি তোমাকে সুযোগ দিইনি?

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, মানুষ আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করবে, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেখানে ভালো কাজ করবো, নেক আমল করবো। উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলবেন–

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ (سُوْرَةُ فَاطِر)

'আমি কি তোমাদের এত পরিমাণ জীবন দান করিনি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে? তাছাড়া শুধু জীবন দান করে ছেড়ে দিইনি, বরং প্রতিনিয়ত ভীতিপ্রদর্শনকারী, সতর্ককারী পাঠিয়েছি। বহু নবী পাঠিয়েছি। সর্বশেষ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছি। তারপর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরাম তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তোমাদের থেকে গাফলতের আবরণ দূর করতে চেয়েছেন। তারা তোমাদেরকে বলেছেন : সময়টাকে আল্লাহর রাহে কাজে লাগাও।

কে সতর্ককারী

এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন তাফসীর পেশ করেছেন। কেউ বলেছেন : নবীগণ এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ, যাঁরা মানুষ সতর্ক করেছেন। অন্য তাফসীরকার বলেছেন : 'সতর্ককারী' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাদা চুল। অর্থাৎ– চুলসাদা হয়ে গেলে মনে করতে হবে আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এবার আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে তাওবার আর নিজেকে শুধরে নেয়ার। অন্য মুফাসসিরদের উক্তি হলো, সতর্ককারী অর্থ নাতি।

অর্থাৎ- মানুষের নাতি জন্ম নেয়া মানে দাদাকে সতর্ক করে দেয়া। যেন একথা বলা যে, দাদা মিয়া! তোমার চলে যাওয়ার সময় এসেছে। এবার চলে যাও এবং আমাদের স্থান খালি করে দাও।

মালাকুল মওতের সাক্ষাতকার

ঘটনাটি শুনেছি আমার আব্বাজানের কাছে। এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো মালাকুল মওত আজরাঈল (আ.)-এর সাথে। আজরাঈল (আ.)কে সে অভিযোগ করে বললো : আশ্চর্য! আপনার কাজ খুবই অদ্ভুত। আপনি দুনিয়ার নিয়মের কোন ধার ধারেন না। দুনিয়ার নিয়ম হলো, গ্রেফতারের পূর্বে আদালত আসামীর কাছে নোটিশ পাঠায়। নোটিশে মামলার বিবরণ থাকে। কৈফিয়ত পেশ করার আহবান থাকে। অথচ আপনি করেন তার উল্টো। বিনা নোটিশে গ্রেফতার করেন। হঠাৎ এসে ধরে নিয়ে যান। একি অবাক কাণ্ড!

আজরাঈল (আ.) উত্তর দেন : আমি উল্টো কাজ করি না। আমিও নোটিশ পাঠাই। বরং অনেক নোটিশ পাঠাই। দুনিয়ার কোনো আদালত আমার চেয়ে বেশি নোটিশ পাঠায় না। অথচ তোমরা আমার নোটিশের কোনো মূল্য দাও না। যেমন- তোমার যখন জ্বর হয়, এটা আমার নোটিশ। তোমার অসুখ আমার নোটিশ। তোমার নাতির আগমন আমার নোটিশের বিবরণ। এভাবে এক দুইটা নয়, বরং অনেক নোটিশ আমি পাঠাতে থাকি। কিন্তু তোমরা এসব নোটিশের কোনো গুরুত্ব দাও না।

হ্যাঁ, এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আক্ষেপের সময় আসার পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে যাও। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেকে সামলে নাও। সুস্থতা এবং অবসরতাকে কাজে লাগাও। আগামী কালের খবর আল্লাহই ভালো জানেন।

যা করতে চাও এখনই করে নাও

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) আমাদের সতর্ক করতেন। বলতেন : তোমাদের যৌবন আল্লাহর দান। সুস্থতা আল্লাহর দান। অবকাশ কিংবা অবসর গ্রহণের সুযোগ আল্লাহর দান। আল্লাহর এতসব দানের মূল্য দাও। সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাও। যা করতে চাও, এখনই করে নাও। ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার করার এখনই সময়। গুনাহ থেকে বাঁচার সুযোগ এখনই। অসুস্থ হয়ে গেলে, দুর্বল হয়ে পড়লে কিছু করার আর সুযোগ থাকবে না। সুযোগ তখন হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তিনি আমাদেরকে উক্ত উপদেশ শোনাতেন আর কবিতা আবৃত্তি করতেন-

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں

وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

তখন যদি তামান্না হয় আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করবে, পারবে না। ক্ষমতা ও সামর্থ থাকবে না। আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করার সুযোগ থাকবে না।

আফসোস হবে দু-রাকাত নামাযের জন্যও

একবারের ঘটনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি কবর দেখতে পেয়ে সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন। দু' রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সওয়ারীতে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন। সাথীরা ভাবলেন, হয়ত কোনো মহান ব্যক্তির কবর হবে বিধায় তিনি এমন করেছেন। কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে এক সাথী জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! কী ব্যাপার! আপনি এখানে কেন নামলেন? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর উত্তর দিলেন : আমি এ পথে যাচ্ছিলাম, তখন আমার অন্তরে ভাবনা হলো, যারা কবরবাসী হয়ে গেছে, তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, তারা আফসোস করবে আর বলবে, হায়, যদি দু' রাকাত নামায পড়ার সুযোগ হতো! যদি আমার আমলনামায় দু'রাকাত নামায যোগ হতো, কতই না ভালো হতো। কিন্তু তাদের এই শত আফসোস কোনো কাজে আসবে না। তাই আমি ভাবলাম, আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ তিনি আমাকে দান করেছেন। ভাবনার উদয় হওয়ার সাথে সাথে নেমে পড়লাম আর দু'রাকাত নামায আদায় করে নিলাম।

আসলে আল্লাহ যাঁদেরকে পরকালের ভাবনা দান করেছেন, তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবে কাজে লাগান।

নেক আমল করো, মীযান পূর্ণ করো

একেকটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। এজন্য বলা হয়েছে যে, মরণের আরজু করবে না। যেহেতু জানা নেই মৃত্যুর পর কী হবে। বরং জীবন থাকতে সময় এবং সুযোগের সঠিক ব্যবহার করো। পরে কিছু হয় না। সময় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মূল্যবান গনীমত। এটাকে অবহেলা করে নষ্ট করে দিও না। হাদীস শরীফে

এসেছে, একবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়লে মীযানের অর্ধেক পাল্লা নেকীতে ভরে যায়। চিন্তা করুন, আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান। অথচ সময় অযথা ব্যয় হচ্ছে। অনর্থক চলে যাচ্ছে, গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন। আল্লাহর পথে জীবনকে ব্যয় করা উচিত। [কানযুল উম্মাল]

হাফেজ ইবনে হাজার এবং সময়ের কদর

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ছিলেন একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার, ইলমের সাগর, আমলের পাহাড়। আমলের সুউচ্চ মাকাম আল্লাহ তাকে দান করেছেন। যে মাকাম বর্তমানের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। বিদগ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস এবং লেখক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁর জীবনীতে আছে, তিনি কিতাব লিখতেন। লিখতে লিখতে যখন কলমের মাথা ভোতা হয়ে যেতো, তখন বারবার এটাকে চোখা করতে হতো। সে সময়ের কলম ছিলো বাঁশের। এটাকে বারবার চোখা করতে হতো। কাজটি করতে হতো চাকু দ্বারা। এতে কিছু সময় ব্যয় হতো। কিন্তু তিনি এ সামান্য সময় অযথা যেতে দিতেন না। এ সময়ে তিনি কালিমায়ে ছুয়ম سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পড়তে থাকতেন। যেন এতটুকু সময় নষ্ট হওয়া ছিলো তার জন্য খুবই কষ্টকর। কেন বেকার যাবে এ সময়টুকু।

সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, জীবনের কদর করো, সময়ের মূল্যায়ন কর। এটাকে অবহেলা করো না। সময় এবং জীবন নষ্ট করে দিও না।

হযরত মুফতী সাহেব এবং সময়ের হিসাব

বর্তমানে আমাদের সমাজ ও পরিবেশে সবচে বেশি অবহেলার বস্তু হলো সময়। যেমন-তেমন করে শেষ করে দিচ্ছি আমাদের সময়। গল্প-গুজব, আড্ডা এবং বেহুদা কাজে ব্যয় হচ্ছে আমাদের সময়। সময়কে এমন কাজে হত্যা করা হচ্ছে, যে কাজে না আছে আখেরাতের ফায়দা, না আছে দুনিয়ার মুনাফা।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলতেন : আমার সময়কে আমি খুব হিসাব করি। একটি মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখি। আমার সময় হয়তো দ্বীনের কাজে কিংবা দুনিয়ার কাজে লাগাই। নিয়ত পরিশুদ্ধ হলে দুনিয়ার কাজও তো দ্বীনে পরিণত হয়। তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন : যদিও শরমের কথা। তবুও বলছি তোমরা যেন বুঝতে পার। মানুষ ইস্তিঞ্জায় বসলে

আল্লাহর যিকির করতে পারে না। কারণ, তখন যিকির করা নিষেধ। অন্য সব কাজও তখন নিষেধ। আর আমার অভ্যাস হলো, তখন আমি ইস্তিঞ্জাখানার লোটা পরিষ্কার করি। উদ্দেশ্য সময় যেন নষ্ট না হয়। লোটা ব্যবহারের সময় অন্য কেউ যেন দুর্গন্ধ কিংবা ময়লার কারণে কষ্ট না পায়।

তিনি আরো বলতেন : আমার আগ থেকেই চিন্তা থাকে যে, অমুক সময় আমি পাঁচ মিনিট হাতে পাবো। সে পাঁচ মিনিটে আমি কি কাজ করবো, এর একটা পরিকল্পনা করে রাখি। যেমন খাওয়া-দাওয়ার পর সাথে সাথে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে লেখাপড়ায় লেগে যাওয়া উচিত নয়। দশ মিনিট অবসর থাকা উচিত। আমি আগ থেকেই স্থির করে রাখি যে, এ পাঁচ-দশ মিনিটে অমুক কাজটি সেরে ফেলবো। পরিকল্পনামাফিক সেরেও ফেলি।

যাঁরা মুফতী সাহেবকে দেখেছেন, তারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি গাড়ীতে ভ্রমণ করছেন, সেখানেও কলম চলছে। আমি তো তাঁকে রিকশাতে চড়েও লিখতে দেখেছি। রিকশার ঝাকুনি সত্ত্বেও তাঁর কলম থেমে নেই। তিনি স্মরণ রাখার আরেকটি সুন্দর কথা বলতেন। 'আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।' তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন–

কাজ করার উত্তম পদ্ধতি

অবসর হলে করবো বলো যে কাজটি ফেলে রাখ, সে কাজ আর তোমার করা হবে না। কাজ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, দুটি কাজের ফাঁকে তৃতীয় আরেকটি কাজ জোরপূর্বক ঢুকিয়ে দাও। দেখবে কাজ হয়ে যাবে। আমি আমার আব্বার কাছে এ ব্যাপারে ঋণী। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন। তাঁর শেখানো এ কথাটি সব সময় আমি মনে রাখি। আর বাস্তবেও দেখেছি, ফেলে রাখা কাজ আর করা হয় না। কারণ, ব্যস্ততা তো বাড়ছে বৈ কমছে না। ফলে সময় ও সুযোগ হয়ে ওঠে না। হ্যাঁ, মানুষের অন্তরে কোনো কাজের গুরুত্ব থাকলে সে কাজ করেই ছাড়ে। সময় আর সুযোগ তখন গৌণ হয়ে যায়, যে-কোনোভাবে কাজ করে নেয়। শত ঝামেলার মাঝেও সে কাজটি করে নেয়।

এরপরেও কি দেল গাফেল থাকবে

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : সময়ের সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি হলো, যেমন তোমার মনে জাগলো অমুক সময়ে কুরআন তেলাওয়াত করবো কিংবা নফল নামায পড়বো। তারপর যখন সময়টা আসলো, তখন

তোমার মন বেঁকে বসলো। মন উঠতে চাচ্ছে না। এ সময় মনকে শাসাতে হবে। মনকে বলবে, আচ্ছা, এখন তুমি অলসতা করছো, বিছানা ছাড়ার ইচ্ছা হচ্ছে না। এ মুহূর্তে যদি প্রেসিডেন্টের পয়গাম আসে যে, তোমাকে বড় পুরস্কার দেয়া হবে কিংবা বড় পদ অথবা চাকরি দেয়া হবে; সুতরাং তুমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করো, তখন তোমার মন নিশ্চয় জেগে উঠবে। তুমি চকিত হবে। অলসতা ঝেড়ে ফেলবে। খুশিতে লাফিয়ে উঠবে। প্রেসিডেন্টের কাছে দৌড়ে যাবে। বোঝা গেলো, প্রেসিডেন্টের পুরস্কার তোমাকে তাড়িয়ে নিবে। মনের ওজর দূর হয়ে যাবে এবং মনের ওজর কোনো ওজর নয়। এটা নফসের টালবাহানা। প্রকৃতই যদি ওজর হতো, তাহলে সে প্রেসিডেন্টের পুরস্কারের জন্য যেতো না। বরং বিছানাতেই পড়ে থাকতো। সুতরাং ভাবো, দুনিয়ার একজন প্রেসিডেন্ট, যিনি মূলত একজন অক্ষম ব্যক্তি। অথচ তার পয়গাম, তার ডাকের গুরুত্ব তোমাদের কাছে কত বেশি। আর যিনি সারা জাহানের অধিপতি, আহকামুল হাকিমীন, ক্ষমতা দেয়া এবং নেয়ার মালিক যিনি, সেই তাঁর দিকে ডাকা হচ্ছে, অথচ আমরা অলসতা দেখাচ্ছি। এ জাতীয় শুভ কল্পনার স্নিগ্ধতায় ইনশাআল্লাহ আপনার হিম্মত বাড়বে। বেকার সময় ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে।

নফসের তাড়না এবং তার চিকিৎসা

হযরত ডা. আবদুল হাই একবার বলতে লাগলেন : এই যে গুনাহ করার বাসনা অন্তরে জাগে, তারও চিকিৎসা আছে। তার চিকিৎসা হলো, যেমন– অন্তর যখন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য তাড়িত হবে, দৃষ্টির অবৈধ ব্যবহার করে মজা নেয়ার বাসনা যখন অন্তরে জেগে উঠবে, তখন ভাববে, এ অবস্থায় যদি আমার আব্বাজান আমাকে দেখেন, তাহলে তখনও কি আমি কাজটি করতে পারবো? কিংবা আমার জানা আছে, হয়ত আমার শায়খ বা পীর আমাকে দেখে ফেলবেন, এরপরেও কি কাজটি করতে পারবো? অথবা আমার ছেলে-মেয়েরা যদি কাজটি দেখে, তাহলেও কি আমি কাজটি করবো? বলা বাহুল্য, নিশ্চয় তাদের সামনে এ অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন তো দৃষ্টিকে অবনত রাখবো। মনের কামনা যতই তীব্র হোক, তখন পরনারীর প্রতি তাকানো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

তারপর চিন্তা করো, তাদের দেখা কিংবা না দেখার কারণে আমার দুনিয়া ও আখেরাত তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার এ অবস্থা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দেখছেন, তবুও কেন আমার বোধোদয় হয় না! তিনি তো এ কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দেবেন। তাহলে তাঁকেই তো ভয় পাওয়া উচিত।

এ রকম ভাবনা-চেতনা গড়ে তুলতে পারলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন।

তিনি বলতেন : যদি তোমার জীবনের ফ্লিম চালিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তোমার মানসিক অবস্থা অবশ্যই দুরাবস্থার শিকার হবে। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা আখেরাতে যদি তোমাকে বলে, হে বান্দা! আমি তোমাকে একটি শর্তে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবো। শর্তটি হলো, আমি শুধু একটা কাজ করবো। তোমার শিশুকাল থেকে যৌবনকাল, যৌবনকাল থেকে বৃদ্ধকাল, বৃদ্ধকাল থেকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত তোমার গোটা জীবনের একটা চিত্র আমি ধারণ করে রেখেছি। পার্থিব জগতে তোমার জীবন কেমন কাটিয়েছো তার একটা চিত্র আমার কাছে আছে। আমি এখন সেটা দেখাবো। তোমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-মুরীদ, বন্ধু-বান্ধব, উস্তাদ-পীর– সকলের সামনে তোমার জীবনের ফ্লিমটা চালানো হবে। সেখানে তোমার জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হবে। এতে যদি তুমি রাজি হও, তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।

তারপর হযরত বলেন : এ অবস্থায় মানুষ সম্ভবত আগুনের কঠিন শাস্তিকেও সহ্য করে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, তবুও এসব মানুষের সামনে নিজের পুরা চিত্র ভেসে উঠুক এটা মেনে নেবে না। সুতরাং যে চিত্র তোমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধবের সামনে প্রকাশ হলে তোমার সহ্য হবে না, সে চিত্র আল্লাহর সামনে প্রকাশ পেলে সহ্য হবে কীভাবে? বিষয়টা একটু গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

আগামী কালের জন্য ফেলে রেখো না

সারকথা, আলোচ্য হাদীসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অন্তরের অন্তস্তলে ধরে রাখার যোগ্য। জীবন এক অমূল্য সম্পদ। সময় এক অনন্য দৌলত। এটাকে গলাটিপে মেরো না। আগামী কালের নিয়তে ফেলে রাখা কাজ কখনও করা হয়ে ওঠে না। সুতরাং কাজ করতে চাও তো এখন থেকেই শুরু করো। চটজলদি আরম্ভ করো। তোমার জন্য আগামী কাল আছে কিনা, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কিংবা আসলেও এ উদ্যম ও উৎসাহ থাকবে কি না, তাও জানা নেই। অথবা শক্তি ও সামর্থ্য থাকবে কিনা, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সর্বোপরি তোমার জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কতটুকু? এজন্য কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (اٰل عمران)

'আপন প্রভুর মাগফিরাতের পথে দৌড়ে যাও। দেরি করো না। এখনই যাও। জান্নাতের পথে যাও। যার প্রশস্থতা আকাশ ও জমিনের সমান।'

নেক কাজে তড়িঘড়ি

যে-কোনো কাজ তাড়াহুড়া করে করা ভালো নয়। কিন্তু নেক কাজের বিষয়টা ভিন্ন। যে নেক কাজ তোমার মনে এসেছে, তা তাড়াতাড়ি শুরু করো। مسارعة শব্দের অর্থ অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিযোগিতা করা, মোকাবেলা করা। নেক কাজে এটাই কাম্য। আল্লাহ তাআলা হাদীসটিকে আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিন এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বর্তমানে আমরা গাফলতের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। চব্বিশটি ঘণ্টার কতটা সময় আমরা আখেরাতের ফিকির করি? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عَنْ عَمْرِ بْنِ مَيْمُوْنَ الْاَوْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ - اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (مِشْكٰوة)

'হযরত উমর ইবনে মায়মূন আল আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের আগে গনীমত মনে করো। বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। গরীব হওয়ার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতাকে। মরণের পূর্বে জীবনকে।' [মেশকাত]

যৌবনের কদর করো

উদ্দেশ্য হলো, এ পাঁচটি জিনিস এক সময় শেষ হয়ে যাবে। যৌবনের পর বার্ধক্য আসবে। বার্ধক্যের পর মৃত্যু আসবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। যৌবন তোমার চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং বার্ধক্য হানা দেয়ার পূর্বে যৌবনের কদর করো। একে গনীমত মনে করো। শক্তি, সাহস, সুস্থতা এসব আল্লাহ দিয়েছেন। এগুলোকে গনীমত ভাবো। কাজে লাগাও। কদর করো। বার্ধক্য মানে তো

অক্ষমতা। বুড়ো হয়ে যাওয়া মানে অপারগ হয়ে যাওয়া। তখন হাত-পা চালানোর শক্তি থাকে না। চলাফেরা করার সামর্থ থাকে না।

শেখ সাদীর ভাষায়–

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

'বার্ধক্যে উপনীত হয়ে প্রতাপশালী বাঘও পরহেজগার সাজে। তার শক্তি ও দাপট নিঃশেষ হয়ে যায়। তার হিংস্র থাবা নিস্তেজ হয়ে যায়। শিকারের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যৌবনকালে তাওবা করা নবীদের স্বভাব। সুতরাং যৌবনকাল তোমার জন্য গনীমত। তার সঠিক ব্যবহার করো।

সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ ও অবসর সময়ের কদর করো

এখন তুমি সুস্থ। একদিন হবে রুগ্ন। দুনিয়ার সকল মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ম একটাই। রোগ-ব্যাধি সকলের জন্য অবধারিত। তবে জানা নেই, কখন তুমি রোগী হবে। সুতরাং অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে গনীমত মনে করো। বর্তমানে তুমি অঢেল সম্পদের অধিকারী। কিন্তু এ সম্পদ কি তোমার জন্য স্থায়ী? সকালের ধনী, সন্ধ্যার ফকির– এ তো তুমিও হতে পার। অবস্থার পালাবদল তো আল্লাহই করেন। সুতরাং পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পূর্বে সম্পদকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ করো। সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আখেরাতকে আলোকিত কর।

এখন তুমি অবসর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সময় দিয়েছেন। সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছেন। ভেবো না আজীবন তুমি এ সুযোগ পাবে। একদিন অবশ্যই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ঝক্কি-ঝামেলা তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে। সুতরাং অবসর সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে লাগাও। মরণের আগে জীবনকে অমূল্য সম্পদ মনে করো।

সকাল বেলার দুআ

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর সঠিক পদ্ধতি হলো রুটিনমাফিক চলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কীভাবে কাটাবে এর একটা রোডম্যাপ তৈরি করা। কী কী কাজ করেছি, আরো কী কী কাজ করা প্রয়োজন– এগুলো নিয়ে চিন্তা করা। কোন কাজ ছাড়তে হবে, কোন আমল যোগ করতে হবে, তারও একটা পরিকল্পনা করা। নামাযের পর প্রতিদিন সকালে এই দুআ করবে যে, হে

আল্লাহ! দিন আসছে; আমি বের হবো। আপনিই ভালো জানেন কী অবস্থা সামনে আসবে। হে আল্লাহ! আমি ইচ্ছা করেছি, আজকের দিনটা আখেরাতের কাজে লাগাবো, আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করবো। হে আল্লাহ! আপনি তাওফীক দান করুন। আর প্রতিদিন সকালে এ দুআটি পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِیْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ (ترمذی)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ (ابو داؤد)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা সত্যিই অনন্য। তিনি এমন সব দুআ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যেখানে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ই শামিল হয়েছে। যার জানা আছে, সে প্রতিদিন এ দুআগুলো পড়বে। আর যার জানা নেই, সে যেন নিজ ভাষায় দুআ করে যে, 'হে আল্লাহ! আমি তো নিয়ত করলাম। আপনি আমাকে কুওয়ত ও হিম্মত দান করুন। প্রকৃত শক্তিদাতা ও সাহসদাতা আপনিই। আমার উপর দয়া করুন। চব্বিশ ঘন্টা যেন আপনার মর্জিমাফিক চলতে পারি, সেই তাওফীক দান করুন।' এভাবে প্রতিদিন সকালে দুআ করলে ইনশাআল্লাহ তার সুফল পাওয়া যাবে। দুআর বরকতে চব্বিশটি ঘন্টা ঠিকমতো খরচ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর দুটি কথা লক্ষ্য করুন–

عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ : اَدْرَكْتُ قَوْمًا كَانَ اَحَدُهُمْ اَشَحَّ عَلٰى عُمْرِهٖ مِنْهُ عَلٰى دَرَاهِمِهٖ وَدَنَانِيْرِهٖ وَعَنِ الْحَسَنِ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اِبْنَ اٰدَمَ اِيَّاكَ وَالتَّسْوِيْفَ فَاِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدٍ وَاِنْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فِیْ غَدٍ كَمَا كُنْتَ فِی الْيَوْمِ وَاِلَّا يَكُنْ لَكَ لَمْ تَنْدَمْ عَلٰى مَا فَرَّطْتَ فِی الْيَوْمِ

(كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرِّقَاقِ)

হযরত হাসান বসরী (রহ.)

হযরত হাসান বসরী (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু মানের তাবিঈ। আমাদের মাশায়েখ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকার সূত্রপরম্পরা হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মাধ্যম হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হাসান বসরী (রহ.)-এর পূর্ববর্তী পুরুষ হযরত আলী (রা.)। যারা শাজারা পড়েন, তাঁরা অবশ্যই জানেন, শাজারায় হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর নামও দেদীপ্যমান। বিধায় আমরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর ইহসানের কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। কারণ, ইলম ও মারিফতের সামান্য পুঁজি যা আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন, এসব বুযুর্গদের মাধ্যমেই দান করেছেন। সারকথা, হযরত হাসান বসরী আল্লাহ তাআলার অন্যতম ওলী।

সোনা-রুপার চেয়েও যার কদর বেশি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এ মহান বুযুর্গের দুটি কথা নকল করেছেন। প্রথমটিতে তিনি বলেছেন : আমি কিছু মহামানবের সংস্পর্শ পেয়েছি। অর্থাৎ– সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে ধন্য হয়েছি। যেহেতু তিনি একজন তাবিঈ। তাই তাঁর উস্তাদ হবেন সাহাবী। তিনি বলেন : আমি তাঁদেরকে পেয়েছি। তাঁদের সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছি। তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সোনা-রুপার দিরহামের চেয়েও অধিক কদর করতেন। অর্থাৎ– সাধারণত মানুষ সোনা-রুপার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এগুলোর অর্জনের প্রতি আগ্রহী থাকে। স্বর্ণ পেলে মানুষ খুব হেফাযত করে। চোরের নজর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কেরাম সময়কে এর চেয়েও দামী মনে করতেন।। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে খুব হিসাব করে চলতেন। বেকার ও অবৈধ পথ থেকে সময়কে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন, সময় আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত স্থায়ী নয়। তাই সময়কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতেন।

দু' রাকাত নফলের কদর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময়ে সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমরা যে মাঝে-মধ্যে তড়িঘড়ি করে দু' রাকাত নফল নামায পড়, জানো এর মূল্য কত? তোমরা তো মনে কর, এটা মামুলি ব্যাপার। কিন্তু যারা কবরে শুয়ে আছে, এটা তাদের জন্য বিশাল ব্যাপার। সারা দুনিয়া এবং তার মাঝে বিদ্যমান সকল বস্তুও তাদের কাছে এত দামী নয়, যত দামী এ দু'রাকাত নফল নামায। যেহেতু কবরবাসী এ দু'রাকাত নামাযের জন্যও আফসোস করবে। বলবে, হায়! যদি আরো দু' মিনিট সময় পেতাম, তাহলে দু'রাকাত নফল পড়তাম আর নেকীর পাল্লা ভারি করতাম।

কবরের ডাক

আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) খুব সুন্দর কবিতা বলতেন। পড়ার মতো কবিতা। মূলত এটা চয়ন করা হয়েছে হযরত আলী (রা.)-এর কবিতা

থেকে। কবিতার বিষয়বস্তু হলো– مقبرے کی آواز তথা কবরস্তানের ডাক। কবিদের কল্পনা ভেসে উঠেছে তাদের কলমের মাধ্যমে। কবি কল্পনার জগতে কবরবাসীদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। কবরবাসী যেন পথিককে ডেকে ডেকে বলছে–

مقبرے پر گذرنے والے سن

ٹھہر ہم پر گذرے والے سن

ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے

باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے

'কবরস্তানের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছো পথিক। শোন! দাঁড়াও! আমাকে অতিক্রমকারী পথিক! শোনো! আমরাও একদিন জমিনের উপর চলাফেরা করতাম। নুন থেকে চুন খসলে জ্বলে উঠতাম।'

এ হলো কবরের ডাক। যে ডাকে ধ্বনিত হয়েছে কবরবাসীর আত্মকাহিনী। বলছে, একদিন তোমাদের মত আমরাও ছিলাম এ জমিনের অধিবাসী। তোমাদের মতই আমাদের সবকিছু ছিলো। কিন্তু সেসব কিছুর একটু এখানে নিয়ে আসতে পারিনি। পাথেয় হিসেবে আল্লাহর মেহেরবানী যেটা এসেছে, তাহলো নেক আমল। আমরা কবরবাসীরা তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছি, একটু ফাতেহা পড়ে আমাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করবে। হে পথিক! এখনও সময় আছে। তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়নি। হায় আফসোস! যদি জীবন ফিরে পেতাম!

শুধু আমল সাথে যাবে

কত দরদমাখা ভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বুঝিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেছেন : মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি বস্তু কবর পর্যন্ত যায়। এক. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যায়। কিন্তু তারা তাকে সেখানে রেখে চলে আসে। দুই. কিছু আসবাবপত্র যেমন খাট ইত্যাদি যায়। কিন্তু সেগুলোও সেখানে থাকে না। তিন. তার আমল তার সাথে যায়। শুধু এটা তার সাথে থেকে যায়। প্রথম দুই বস্তু কবরবাসীকে একা ফেলে রেখে চলে আসে। শুধু তৃতীয় বস্তুটি তাকে সঙ্গ দেয়। [বুখারী শরীফ]

এক বুযুর্গ কথাটা কত সুন্দর করে বলেছেন–

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والے شکریہ

اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

'হে কবর পর্যন্ত বহনকারী! তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ মঞ্জিল থেকে আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে হবে একা। এখান থেকে কেউ আমাদের সাথে যাবে না।'

সারকথা, 'কবরের আহবানে' হযরত আলী (রা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখনই তুমি কবরের কাছে যাবে, চিন্তা করবে, কবরের এ বাসিন্দাও তোমার মতো একজন মানুষ ছিলো। তারও মাল-দৌলত ছিলো। আমাদের মতো তারও একটা জীবন ছিলো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তারও ছিলো। তারও অনেক আশা-ভরসা ছিলো। অনেক পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু এখন তার এসব কিছুই নেই। হ্যাঁ, কেবল একটা জিনিস আছে। তাহলো, তার আমল। সে আজ আফসোস করছে যে, হায়! যদি একটু জীবন পেতাম, তাহলে আমল করতে পারতাম।

মরণের আশা করো না

এ সুবাদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কখনও মরণের তামান্না করো না। কঠিন বিপদের মুহূর্তেও মৃত্যুর আশা করো না। তখনও বলো না, হে আল্লাহ! মরণ দাও। যেহেতু যদিও তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু হতে পারে, অবশিষ্ট জীবনে তুমি এমন আমল করবে, যা আখেরাতের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং মৃত্যুর তামান্না না করে অবস্থার পরিবর্তন কামনা করো। দুআ করো, হে আল্লাহ! অবশিষ্ট জীবন নেক কাজে কাটানোর তাওফীক দিন।

হযরত মিয়া সাহেবের কাশ্‌ফ

হযরত মিয়া সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন সাহেব (রহ.) ছিলেন আমার আব্বাজানের একজন ওস্তাদ। একজন শানদার ওলী ছিলেন। কাশ্‌ফ ও কারামতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সাহেব নিজের একটা ঘটনা শুনিয়েছেন। হযরত মিয়া সাহেব একবার হজ্জ থেকে তাশরীফ এনেছেন। আমরা তখন দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র। এক ছাত্র বললো : মিয়া সাহেব! হজ্জ করে এসেছেন, চলো যাই, খেজুর খেয়ে আসি। ব্যাপারটা আমাদের কাছে ভালো লাগলো না। কারণ, মিয়া সাহেব বুযুর্গ মানুষ। তাঁর কাছে শুধু খেজুর খাওয়ার জন্য যাবো কেন? তাঁর কাছে তো যাবো দুআর

জন্য। যাহোক আমরা ছয়-সাতজন গেলাম। মিয়া সাহেবের ঘরে পৌঁছে তাঁকে সালাম করলাম। এমন সময় মিয়া সাহেব খাদেমকে ডেকে বললেন : একজন ছাত্র খেজুর খেতে এসেছে, তাকে খেজুর দিয়ে বিদায় করে দাও। আর বাকি ছাত্রদেরকে ভেতরে নিয়ে বসাও। তিনি এমন কাশ্‌ফওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন।

অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার পন্থা

আমার আব্বাজান মিয়া সাহেবের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন : একবার আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : মৌলভী সাহেব! আজকে আমাদের কথাবার্তা চলবে আরবীতে। একথা শুনে আমি তো থ বনে গেলাম। কখনও তো এমন হয়নি! আজ কেন এমন হলো! আল্লাহই ভালো জানেন। জিজ্ঞেস করলাম : হযরত! কেন? তিনি উত্তর দিলেন : আসলে আমরা যখন কথাবার্তা বলি তখন লাগামছাড়া হয়ে যাই। যবান তখন নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আর আরবী তুমিও অনর্গল বলতে পারো না, আমিও পারি না। তাই আরবীতে বললে সব প্রয়োজনীয় কথাই হবে, অপ্রয়োজনীয় কথা হবে না।

হযরত থানবী (রহ.) ও সময়ের কদর

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : আমি নিজে দেখেছি যে, হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তারগণ তাঁকে কথাবার্তা এবং অন্যদের সাথে সাক্ষাত সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিলেন। এই অবস্থায় তিনি চোখ বন্ধ করে একদিন শুয়ে ছিলেন। ইতোমধ্যে হঠাৎ একবার চোখ খুললেন এবং বললেন : ভাই! মৌলভী শফী সাহেবকে ডাক। তাঁকে ডাকা হলো। থানবী (রহ.) তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন : আপনি তো 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থ লিখছেন। এইমাত্র আমার মনে পড়লো, কুরআন মাজীদের অমুক আয়াত দ্বারা অমুক মাসআলা বের হয়। মাসআলাটি ইতোপূর্বে কোথাও আমার নজরে পড়েনি। তাই বলে দিলাম। যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবেন, মাসআলাটি লিখে নেবেন। এটুকু বলে পুনরায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। একটু পর আবার চোখ খুলে বললেন : অমুককে ডাকো। যখন এলো, তাকেও কিছু কাজের কথা বললেন। এরূপ যখন বারবার করতে লাগলেন, তখন খানকার নাযিম মাওলানা শাব্বীর আলী (রহ.)– যার সাথে হযরতের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো— হযরতকে বললেন : হযরত! কথাবার্তা বলা ডাক্তারদের সম্পূর্ণ নিষেধ। তবুও আপনি একে ওকে ডেকে কথা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের উপর রহম করুন। প্রতিউত্তরে হযরত থানবী (রহ.) এক অসাধারণ কথা বলেছেন। তিনি

বললেন : কথা তো ঠিক। কিন্তু আমি মনে করি, জীবনের যে মুহূর্তটি অন্যের খেদমতে লাগাতে পারিনি, সেই মুহূর্তটি কিসের জন্য। খেদমতের মাধ্যমে জীবন পার করতে পারা আল্লাহর এক মহা নেয়ামত।

হযরত থানবী (রহ.) ও সময়সূচি

হযরতের দরবারের চব্বিশ ঘন্টা সময়ের একটা কর্মসূচি ছিলো। এমনকি তাঁর প্রতিদিনের আসরের পরের কাজ ছিলো স্ত্রীদের খোঁজখবর নেয়া। তাঁর স্ত্রী ছিলো দু'জন। আসরের পর তিনি তাঁদের কাছে যেতেন। কথাবার্তা বলতেন ও খবরাখবর নিতেন। অত্যন্ত ইনসাফের সাথে এ কাজটি আদায় করতেন। আসলে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর বিবিদের কাছে যেতেন। এক এক করে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিতেন। এ কাজটি তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিদিনই করতেন। তিনি জিহাদের কাজ, তালীমের কাজ এবং দ্বীনের অন্যান্য কাজ করতেন আর পবিত্র বিবিগণের সুখ-দুঃখের খবরও নিতেন। হযরত থানবী (রহ.) নিজের জীবনকে সুন্নাতের উপর গড়ে তুলেছেন। সুন্নাতের অনুসরণে তিনি আসরের পরে নিজের বিবিদের কাছে যেতেন। সময় ভাগ করা ছিলো। পনের মিনিট এক স্ত্রীর ঘরে কাটালে পনের মিনিট কাটাতেন অন্য স্ত্রীর ঘরে। পনের মিনিটের জায়গায় ষোল মিনিট কিংবা চৌদ্দ মিনিট হতো না। সমতার সাথে পনের মিনিট করে উভয় স্ত্রীর ঘরে কাটাতেন। প্রতিটি মিনিট তিনি হিসাব করে ব্যয় করতেন।

আল্লাহ তাআলার অমূল্য নেয়ামত এই সময়। এক অনন্য সম্পদ এটি। প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কবির ভাষায়–

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم

چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم

'বরফের মত শনৈঃ শনৈঃ গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন।'

জন্মবার্ষিকীর তাৎপর্য

নবজাতকের বয়স এক বছর পূর্ণ হলে মানুষ জন্মবার্ষিকী পালন করে, আনন্দ করে। আলোকসজ্জা করে, মোমবাতি জ্বালায়, কেক কাটে। আরো কত কুসংস্কারমূলক কাজ করে। কারণ, জীবনের একটি বছর পূর্ণ হলো। কিন্তু আকবর ইলাহাবাদী চমৎকার কথা বলেছেন–

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا

یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے

'জন্মবার্ষিকী পালন হলো তথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমার জীবনের একটি বছর ঝরে গেলো।'

দেখার বিষয় হলো, এটা কি আনন্দের বিষয়, না দুঃখের বিষয়? এটা কি কান্নার ব্যাপার, না হাসির ব্যাপার? এটা তো আফসোসের ব্যাপার। যেহেতু জীবন থেকে বিয়োগ হলো একটি বছর।

চলে-যাওয়া জীবনের জন্য বেদনা

মুহতারাম আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) জীবনের ত্রিশটি বছর পার করার পর অবশিষ্ট জীবন এ আমল করেছেন। জীবন থেকে কিছু বছর বিদায় নেয়ার পর তিনি শোকগাঁথা কবিতা বলতেন। সাধারণত মানুষের মৃত্যুর পর শোকগাঁথা বলা হয়। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আমার আব্বাজান নিজের শোকগাঁথা নিজেই পড়তেন। এ শোকগাঁথার নাম রাখতেন, 'মরসিয়ায়ে উমরে রফতাহ' তথা অতীত জীবনের শোক। আমাদের অনুভূতি যদি আল্লাহ তাআলা ভোঁতা না করে থাকেন, তাহলে বুঝে আসবে যে, চলে-যাওয়া- সময় আর ফিরে আসে না। তাই অতীত জীবন নিয়ে আনন্দ নয়, বরং আগামী জীবন নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত। কীভাবে অবশিষ্ট জীবন কাজে লাগানো যায়- এই ফিকির করা উচিত।

আজ আমাদের সমাজে সবচে বেশি অবহেলিত যে বিষয়টি, তাহলো সময়। সময়ের কোনো কদর নেই, মূল্য নেই। ঘণ্টা, দিন, মাস অনর্থক চলে যাচ্ছে, যার মধ্যে দুনিয়ারও ফায়দা নেই, দ্বীনেরও ফায়দা নেই।

কাজ তিন প্রকার

হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন : দুনিয়ায় যত কাজ আছে, সেগুলো তিন প্রকার-

এক. সেসব কাজ, যার মধ্যে কিছুটা ফায়দা আছে; দুনিয়ার ফায়দা কিংবা দ্বীনের ফায়দা।

দুই. সেসব কাজ, যার মধ্যে আছে শুধু ক্ষতি; দ্বীনের ক্ষতি কিংবা দুনিয়ার ক্ষতি।

তিন. সেসব কাজ, যার মধ্যে কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি নেই। দ্বীনেরও লাভ-ক্ষতি নেই। সম্পূর্ণ অনর্থক কাজ।

এরপর তিনি বলেন : ক্ষতিকর কাজগুলো থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কাজের তৃতীয় প্রকারে কোনো লাভও নেই, ক্ষতিও নেই। আসলেও এটা ক্ষতিকর কাজ। কারণ, অহেতুক কাজে যে সময়টুকু ব্যয় হচ্ছে, সে সময়টুকু ইচ্ছা করলে কোনো ভালো কাজেও লাগানো যেতে পারে। সে সময়টুকু নষ্ট করে দিলে সময়ের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হলে।

আসলে এটাও বিশাল ক্ষতি

এর দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তি একটি দ্বীপে গেলো। সেখানে একটি সোনার টিলা পেলো। টিলার মালিক তাকে বললো : আমার পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হলো, তুমি যত ইচ্ছা স্বর্ণ নিতে পার। যা নিবে তা তোমার হবে। এর মালিক তুমি হবে। তবে যে-কোনো মুহূর্তে হঠাৎ করে আমি নিষেধ করে দেবো। তখন থেকে স্বর্ণ নেয়ার অনুমতি থাকবে না। তবে কখন নিষেধ করবো, তা তোমাকে আগে বলবো না। নিষেধাজ্ঞার পর তোমাকে জোরপূর্বক এ দ্বীপ থেকে বের করে দেয়া হবে।

এ অবস্থায় নিশ্চয় ওই ব্যক্তি সামান্য সময়ও নষ্ট করবে না। সে কখনও ভাববে না যে, এখনও অনেক সময় আছে, আগে কিছু আনন্দ-ফুর্তি করি তারপর স্বর্ণ ভর্তি করি- এরূপ কোনো চিন্তা তার আসবে না। বরং তার চিন্তা শুধু একটাই থাকবে যে, কী করে এবং কত বেশি এ স্বর্ণ নেয়া যাবে। সে এর জন্য উঠে পড়ে লাগবে। কারণ, যে পরিমাণ স্বর্ণ সে কুড়াবে, সে পরিমাণেরই মালিক সে হবে।

কিন্তু সে স্বর্ণের চিন্তা না করে যদি বসে বসে সময় কাটায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কোনো লাভও নেই, আবার ক্ষতিও নেই। কিন্তু আসলে তার বিরাট ক্ষতি। কারণ, লাভবান হওয়া তার জন্য অসম্ভব ছিলো না। অথচ অলসতার কারণে লাভবান হতে পারলো না।

ব্যবসায়ীর অন্য রকম ক্ষতি

আব্বাজানের কাছে এক ব্যবসায়ী আসা-যাওয়া করতেন। ভদ্রলোক একবার আব্বাজানের নিকট এসে অনুযোগের সুরে বললেন : হুযূর! কী বলবো, দুআ করবেন। ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেছে। আব্বাজান বলেন : তার কথা শুনে আমি মর্মাহত হলাম। ভাবলাম, আহা! বেচারা হয়ত মহা মুসিবতে পড়েছে। জিজ্ঞেস করলাম : কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে? ভদ্রলোক বললো : হুযূর! কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। আব্বাজান বললেন : একটু খুলে বলুন, কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং কীভাবে ক্ষতি হয়েছে। এবার ভদ্রলোকের বিস্তারিত বিবরণে বোঝা

গেলো, মূল ব্যাপার হলো, ব্যবসায় তার কয়েক কোটি টাকা লাভ হওয়ার কথা ছিলো, তা হয়নি। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে যে লাখ লাখ টাকা লাভ হতো, তা তো অবশ্যই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এতে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। এখন শুধু যে পরিমাণ লাভ হওয়ার কথা ছিলো, সে পরিমাণ লাভ হয়নি। ধারণামাফিক লাভ না হওয়াটাই তার ভাষায় মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে। আব্বাজান বলেন : লোকটি লাভ না-হওয়াকে ধরে নিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে। অথচ আফসোস! দ্বীনের ব্যাপারে মানুষ এ ধরনের চিন্তা করে না। যে সময়টুকু আমার অযথা কাটে, তাতে ক্ষতি হয়নি ঠিক। কিন্তু লাভও তো হয়নি। সুতরাং এটাও তো এক প্রকার ক্ষতি।

এক ব্যবসায়ীর কাহিনী

ঘটনাটি দারুণ। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বিবেক দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন তারা ঘটনাটি থেকে উপদেশ নিতে পারেন। আমাদের এক বুযুর্গ, যিনি একজন প্রসিদ্ধ হাকিমও। ঘটনাটি তিনি শুনিয়েছেন।

এক আতর ব্যবসায়ী ওষুধও বিক্রি করতো। তার ছেলেও তার সাথে দোকানে বসতো। একদিন তার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। তাই ছেলেকে বললো : দেখো, আমাকে এক জায়গায় কাজে যেতে হবে। তুমি দোকান দেখাশুনা করবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেচাকেনা করবে। ছেলো বললো : ঠিক আছে। ব্যবসায়ী ছেলেকে প্রতিটি জিনিসের মূল্য বুঝিয়ে দিলো এবং নিজের কাজে চলে গেলো। একটু পর এক ক্রেতা শরবতের বোতল কিনতে আসলো। ছেলে তার কাছে দুটি বোতল দু'শ টাকায় বিক্রি করলো। তারপর যখন ব্যবসায়ী ফিরে আসলো, ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো : কী কী বিক্রি করলে? ছেলে বললো : অমুক অমুক জিনিস বিক্রি করেছি। দুটো বোতলও বিক্রি করেছি। পিতা জিজ্ঞেস করলো : বোতল দু'টি কত টাকায় বিক্রি করলে? ছেলে উত্তর দিলো : একশ টাকা করে দু'শ টাকায় বিক্রি করেছি। ছেলের কথা শুনে পিতার তো মাথায় হাত। বললো : তুমি তো আমার সর্বনাশ করে দিলে। বোতলগুলোর দাম তো দু'হাজার করে চার হাজার টাকা ছিল। পিতা ছেলেকে শাসালো। এতে ছেলেও লজ্জিত হলো, দুঃখ পেলো। পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। বললো : আব্বাজান! আমাকে ক্ষমা করুন। ভুলে আপনার বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছি। পিতা যখন দেখলো যে, ছেলে চিন্তিত, দুঃখিত এবং মর্মাহত, তখন তার মনে দয়া জেগে উঠলো। ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো : বাবা! এত বেশি পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই একশ' টাকার মধ্যে আটানব্বই টাকা তো এখনও

লাভ আছে। যদি তুমি একটু সতর্ক হতে, তাহলে প্রতিটি বোতলে দু'হাজার টাকা করে পেতাম। ক্ষতি হলে এটাই হয়েছে। পুঁজি থেকে তো যায়নি!

সারকথা, ব্যবসায়ীরা লাভ না হওয়াকেও ক্ষতি হয়েছে বলে প্রকাশ করে। এ হলো দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের নীতি। দুনিয়ার ব্যবসার নীতি যদি লাভ না হওয়াটাই ক্ষতি হয়, তাহলে আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ না-করাটাও অবশ্যই অপূরণীয় ক্ষতি।

এজন্যই ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন : জীবনের যে মুহূর্তটিতে কোনো কাজ নেই, সেই মুহূর্তটিকে কাজে না লাগানো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এটাও ক্ষতির শামিল। লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই সেটাতেও মূলত ক্ষতিই লুকায়িত। কারণ, তুমি ইচ্ছা করলে এ সময়টাকে আখেরাতের কাজে লাগাতে পারতে। অনেক ফায়দা অর্জন করতে পারতে। অযথা সময় কাটানোর নাম তো জীবন নয়!

বর্তমান যুগ এবং সময়ের বাজেট

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবো, আল্লাহ তাআলা বর্তমান যুগে আমাদেরকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। আমরা এমন কিছু নেয়ামত ভোগ করছি, যেগুলো আমাদের বাপ-দাদারা কল্পনাও করতে পারেনি। যেমন আগের যুগে রান্নার জন্য লাকড়ি জোগাড় করতে হতো। তারপর সেই লাকড়ি শুকোতে হতো। চা বানাতেও তখন আধ ঘন্টা চলে যেতো।

আর এখন গ্যাসের চুলোয় পাতিল বসালেই দু' মিনিটে চা হয়ে যায়। তাহলে এখন চা বানাতে আটাশ মিনিট বেঁচে যায়। আগেকার যুগে রুটি বানাতে হলে প্রথমে গম জোগাড় করতে হতো। তারপর যাঁতায় পিষে আটা তৈরি করতে হতো। এরপর আটা গুলিয়ে গোল্লা বানিয়ে রুটি বানাতে হতো। আর বর্তমানে একই সুইচ টিপলেই আটা হয়ে যায়। এ কাজে বেশ সময় বেঁচে গেলো। এসব সময় আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত। আজকাল নারীদেরকে যদি বলা হয়, অমুক কাজটি করো, উত্তর আসবে, সময় পাই না। অথচ পূর্ব যুগের নারীরা এত কাজ করার পরও ইবাদত-বন্দেগীর জন্য অনেক সময় পেতো। তাদের কুরআন তেলাওয়াতেরও সময় ছিলো। যিকির-আযকারের সময় ছিলো। আর বর্তমানে নারীদেরকে যদি বলা হয় যে, তেলাওয়াতের সময় কি হয় না? উত্তর দিবে, সংসার সামলাবো, না তেলাওয়াত করবো। সময়ই তো হয় না।

আগের যুগে সফর করতে হতো পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে। তারপর আসলো ঘোড়ার গাড়ি কিংবা সাইকেল। আর এখন? সে যুগে যে পথ

অতিক্রম করতে মাস কেটে যেতো, এখন সে পথ অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময়ও লাগে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে গতকাল ছিলাম মদীনা শরীফে। গতকাল সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশাসহ চার ওয়াক্ত নামায আদায় করেছি। আর আজ জুমার নামায এখানে করাচিতে পড়েছি। সে যুগের মানুষ এটা কখনও কল্পনা করেছে? আগের যুগে তো মানুষ মক্কা-মদীনায় সফরের পূর্বে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতো। কারণ, সেটা কয়েক মাসের সফর হতো। আর এখন তো আল্লাহ তাআলা সফরকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মানুষ মক্কা-মদীনায় পৌঁছে যেতে পারে। যে সফর আগেকার যুগে এক মাসব্যাপী করতে হতো, সে সফর এখন এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। অবশিষ্ট উনত্রিশ দিন গেলো কোথায়? কোন কাজে ব্যয় হলো? বোঝা গেলো, উনত্রিশ দিন আমরা নষ্ট করি। আর বলি– অবসর নেই, সময় নেই। কেন সময় নেই?

এসব নেয়ামত তো আল্লাহ দিয়েছেন, যেন মানুষ তাঁর যিকির করার, ইবাদত করার এবং তার দিকে যাওয়ার সময় পায়। আখেরাতের ফিকির এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পায়।

শয়তান অজান্তে ব্যস্ত করে দিলো

শয়তান চিন্তা করলো, যে সময়টা বেঁচে গেলো, সে সময়টা মানুষ যেন আল্লাহর ইবাদতে না লাগাতে পারে। এজন্য শয়তান তার মধ্যে অন্য ফিকির ঢুকিয়ে দিলো। আমাদের অজান্তে আমাদেরকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দিলো। মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো যে, ঘরে এ কাজটি হওয়া উচিত। অমুক জিনিস দরকার। অমুক বস্তু না হলে সবই বেকার। এবার ওই বস্তু কেনার জন্য টাকা দরকার। টাকা কামানোর জন্য করতে হবে অমুক কাজ। এভাবে শুরু হয়ে গেলো নতুন চিন্তা, নতুন কাজ। বর্তমান সকলেই দুশ্চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। অনেক সময় কাটাই গল্পগুজব করে। সময় কাটাই একটা অযথা বিষয়ের অবতারণা করে। এসব কিছু মূলত সময়ের অপব্যয় বৈ কিছু নয়।

মহিলাদের মাঝে সময়ের অবমূল্যায়ন

সময় নষ্ট করার স্বভাবগত ব্যাধি মহিলাদের মধ্যে বেশি। তারা মিনিটের কাজে ব্যয় করবে ঘণ্টা। দু'জন বসলে শুরু করবে লম্বা-চওড়া কথা। কথা যত লম্বা হবে, গীবত-শেকায়েতও তত বেশি হবে। মিথ্যাচার শুরু হবে। অন্যের জন্য

পীড়াদায়ক বিষয়ের অবতারণা হবে। দীর্ঘ সময়ের গল্পগুজবে বিভিন্ন রকম গুনাহ সংযুক্ত হবে। এজন্য হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন : আমি এমন কিছু মহামানবের সংস্পর্শ পেয়েছি, যারা সময়কে সোনা-রুপার চেয়েও দামী মনে করতেন। অহেতুক কাজে সময় ব্যয় করা থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন।

প্রতিশোধ নেয়ার পেছনে পড়ে কেন সময় নষ্ট করবো?

এক ব্যক্তি বের হয়েছে আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্কে জানার জন্য। পথে এক বুযুর্গের দেখা পেলো। তাঁর কাছে নিজের উদ্দেশ্যের কথা খুলে বললো। বুযুর্গ বললো : তুমি অমুক মসজিদে যাও। সেখানে তিনজন বুযুর্গকে দেখবে, যাঁরা আল্লাহ তাআলার যিকিরে লিপ্ত আছেন। তুমি গিয়ে তাঁদেরকে ঢিল ছুঁড়ে মারবে। লোকটি মসজিদে গেলো এবং তিনজন বুযুর্গকে দেখতে পেলো যে, সকলেই আল্লাহর যিকিরে মগ্ন। সে একটা ঢিল নিলো এবং পেছন থেকে তাঁদের একজনের দিকে ছুঁড়ে মারলো। কিন্তু আশ্চর্য! বুযুর্গ ঢিল খেয়েও পেছনে ফিরে তাকালেন না। তিনি নিজের যিকিরেই ব্যস্ত রইলেন। কেন তাকালেন না? কেন তিনি যিকিরে ব্যস্ত থাকলেন? কারণ, সময় নষ্ট হবে। তিনি ভাবলেন, যতক্ষণে আমি পেছনে ফিরে দেখবো যে, কে আমাকে ঢিল মেরেছে এবং এর জন্য আমি প্রতিশোধ নিবো, ততক্ষণে বেশ কয়েকবার আমি 'সুবহানাল্লাহ' পড়ে নেবো। এতে আমার অনেক লাভ হবে। প্রতিশোধ নেয়ার পেছনে সময় ব্যয় করলে তো সেই লাভ হবে না।

হযরত মিয়াজি নূর মুহাম্মদ (রহ.) ও সময়ের কদর

হযরত মিয়াজি নূর মুহাম্মদ যানযানুবী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিলো, বাজারে গেলে টাকার থলে হাতে রাখতেন। কেনাকাটা করে নিজের হাতে টাকা দিতেন না। টাকার থলে দোকানীর সামনে রেখে দিয়ে বলতেন : ভাই! কত টাকা হয়েছে, হিসাব করে নাও। কারণ, টাকা গুণতে গেলে আমার সময় নষ্ট হবে। ততক্ষণে আমি কয়েকবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়ে নেবো।

একবার তিনি টাকার থলে হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে এক ছিনতাইকারী টাকা নিয়ে দৌড় দিলো। তিনি একটু ফিরেও তাকালেন না যে, থলেটা কে নিয়ে গেলো? কোথায় নিয়ে গেলো? তিনি বাড়িতে চলে এলেন। কারণ, তিনি চিন্তা করলেন, লোকটিকে ধরার জন্য পেছনে পেছনে দৌড়ানোর চেয়ে 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিকির অধিক লাভজনক হবে।

এটাই ছিলো বুযুর্গদের স্বভাব, যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে ফিরেছেন আখেরাতের লাভ।

ব্যাপার তো আরো নিকটে

আসলে এটা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের উপর আমল, যে হাদীসটি পড়ার পর আমার অন্তরে ভয় জেগে ওঠে। তবে বুযুর্গানে দ্বীন থেকে যেহেতু এর ব্যাখ্যা শুনিনি, তাই খুব উদ্বিগ্ন নই। হাদীসটি অত্যন্ত উপদেশমূলক।

হাদীসটি হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন : আমার একটা কুঁড়েঘর ছিলো, যার বিভিন্ন স্থান ভেঙেচুরে গিয়েছিলো। একদিন আমি ঘরটি ঠিকঠাক করছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন : কী করছো? বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! ঝুপড়ি ঘরটা একটু মেরামত করছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললো :

مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَالِكَ

'আমার মনে হয়, ব্যাপার তো আরো নিকটে।'

অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা যে জীবন দান করেছেন, জানা নেই, তার অবসান কখন ঘটবে, কখন মৃত্যু ঘন্টা বাজবে এবং আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে। হাতে যে সময়গুলো আছে, তা অত্যন্ত মূল্যবান; অথচ তুমি অতিরিক্ত কাজে ব্যস্ত। [আবু দাউদ]

দেখুন, এ সাহাবী তো কোনো বিশাল টাওয়ার নির্মাণ করছিলেন না অথবা ঘরের শোভাবর্ধনে ব্যস্ত ছিলেন না কিংবা অতিরিক্ত আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করছিলেন না। তিনি শুধু একটা ঝুপড়ি মেরামত করছিলেন। এতেই তিনি বলে দিলেন : ব্যাপার তথা মৃত্যু তো মনে হয় আরো নিকটবর্তী। উলামায়ে কেরাম হাদীসটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : হাদীসটির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে কাজে বাধা দেননি। বলেননি যে, কাজটি তোমার জন্য নিষেধ। কারণ, সাহাবী গুনাহের কাজে লিপ্ত ছিলেন না। মুবাহ এবং জায়েজ কাজ ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো, সাহাবীর চেতনাবোধ সজাগ করে দেয়া। তোমার সকল চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা-তদবীর শুধু দুনিয়ার জন্য হবে- এমনটি কখনও করো না। সব সময় আখেরাতের কথা মাথায় রেখো।

আমরা যদিও এসব মহামানবের অনুসরণ ষোল আনা করতে পারবো না, কিন্তু কমপক্ষে এতটুকু তো করতে পারবো যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সময়। সুতরাং তার কদর করবো, আখেরাতের ভাবনা জাগ্রত রাখবো।

বস্তুত মানুষ ইচ্ছা করলে চব্বিশ ঘণ্টা সময় আখেরাতের কাজে লাগাতে পারে। চলাফেরার সময় মুখে আল্লাহর যিকির চালু থাকলে, নিয়ত বিশুদ্ধ হলে তখন সময় বিফলে যাবে না।

দুনিয়ার সঙ্গে নবীজির সম্পর্ক

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে বিছানায় ঘুমোতে যেতেন, তখন তার পবিত্র দেহে দাগ পড়ে যেতো। একবার আমি তাঁর বিছানা চাদরকে ভাঁজ করে ডাবল করে দিয়েছিলাম, যেন দেহ মুবারকে দাগ না বসে এবং তিনি যেন একটু আরাম বোধ করেন। সকালে তিনি ঘুম থেকে জেগে বললেন : আয়েশা! বিছানাকে ডাবল করো না। একে একপাট করে রাখবে।

আরেকবারের ঘটনা। হযরত আয়েশা (রা.) শোভাবর্ধনের জন্য একটি ছবিযুক্ত কাপড় দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন : পর্দা যতক্ষণ পর্যন্ত না সরাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার ঘরে আসবো না। কারণ, এটি ছবিযুক্ত পর্দা।

অন্য এক সময়ের আরেকটি ঘটনা। হযরত যয়নব (রা.) শোভাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ রকম একটি পর্দা দিয়েছিলেন। অবশ্য তা ছবিযুক্ত ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে যয়নব!

مَا لِي وَالدُّنْيَا. مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

'দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার উপমা হলো একজন আরোহীর ন্যায়, যে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়। তারপর ছায়া ছেড়ে নিজের পথে চলে যায়।'

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দুনিয়ার কাজে বাধা দেননি। কিন্তু নিজের আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, দুনিয়া নিয়ে মেতে উঠো না, দুনিয়ার পেছনে বেশি সময় ক্ষয় করো না। আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (তিরমিযী শরীফ)

এ জগতে কাজের মূলনীতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِعْمَلْ فِى الدُّنْيَا بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِاٰخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيْهَا

'দুনিয়াতে যে পরিমাণ থাকবে, তার জন্য সেই পরিমাণে কাজ করো। আখেরাতের কাজ করো সেই পরিমাণে, যে পরিমাণ সময় সেখানে কাটাবে।' আখেরাত যেহেতু চিরস্থায়ী, তাই তার জন্য কাজও হবে বেশি। দুনিয়া যেহেতু অল্প দিনের, সুতরাং তার জন্য কাজও হবে ক্ষণিকের।

এটা ছিলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। আমরা বলতে চাচ্ছি, আমরা যদিও এত উঁচু স্তরে পৌছুতে পারবো না, মিয়াজি নূর মুহাম্মদ (রহ.)-এর স্থানে কিংবা এ মানের বুযুর্গদের স্তরে পৌছুতে পারবো না, কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার পেছনে পড়ে আমাদের আখেরাত যেন বরবাদ না হয়। এটা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে করেই হোক আখেরাতের কাজে লাগাতে হবে।

সময়ের সদ্ব্যবহারের সহজ কৌশল

সময় থেকে ফায়দা নেয়ার সহজ পন্থা মাত্র দুটি–

এক. সকল কাজে নিয়তকে বিশুদ্ধ করবে। কাজের মধ্যে যেন ইখলাস থাকে। আল্লাহর রেজামন্দি থাকে। যখন খাবার খাবে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য খাবে। উপার্জন করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। বাড়িতে পরিবার-পরিজনের সাথে কথাবার্তা বলবে, তাও আল্লাহর রাজি-খুশি করার জন্যে করবে। সুন্নাতের অনুসরণের নিয়ত করবে।

দুই. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে। চলাফেরার সময় পড়তে থাকবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

এ কাজে পরিশ্রম কম। টাকা-পয়সা খরচ হয় না কিংবা জিহ্বা ক্ষয় যায় না। এভাবে যিকিরে মশগুল থাকলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লেগে থাকবে। অন্যথায় সময়টা ফালতু কাজে যাবে, যার জন্য একদিন আফসোস করতে হবে।

সময়সূচি বানাও

তৃতীয় কথা হলো, বেহুদা কাজ থেকে বেঁচে থাকো। সময়কে মেপে মেপে হিসাব করে খরচ করো। এর জন্য একটা রুটিন তৈরি করে নাও। তারপর

রুটিনমাফিক জীবন যাপন করো। আমার আব্বাজান বলতেন : প্রত্যেক ব্যবসায়ী হিসাবের খাতা বানায়। কত টাকা এলো, কত টাকা খরচ হলো আর কত টাকা লাভ হলো– এর একটা জমা-খরচ থাকে। অনুরূপভাবে তোমরাও হিসাবের খাতা বানাও। কতটুকু সময় বিপথে ব্যয় হলো আর কতটুকু সময় সঠিক পথে গেলো– এরূপ লাভ-ক্ষতির হিসাব করো। সময়ের হিসাব না রাখলে বুঝতে হবে, ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

(سورة الصف)

'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে। আর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে।' (সূরা সফ : ১০-১১)

এটাও জিহাদ

মানুষ মনে করে, এক ব্যক্তি তলোয়ার ও বন্দুক নিয়ে ময়দানে যাবে, কাফেরের সাথে জিহাদ করবে। তারা জিহাদ বলতে শুধু এটাকে বুঝে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জিহাদ। উচ্চমানের জিহাদ। তবে জিহাদ বলতে শুধু এটাকেই বুঝানো হয় না। নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, কামনা- বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং নিজের আবেগ-উত্তেজনাকে অবদমিত করা– এটাও একপ্রকার জিহাদ। অন্তরে আল্লাহর বিধানপরিপন্থী কোনো তাড়না সৃষ্টি হলে তাকে দমিয়ে রাখাও এক প্রকার জিহাদ। অন্যায়-অপরাধ এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধে মনে-প্রাণে ঘৃণা পোষণ করাও এক প্রকার জিহাদ।

এগুলো আখেরাতের ব্যবসা, যার ফায়দা পাওয়া যাবে আখেরাতে। আমি আমার আব্বাজানের মুখে হযরত থানবী (রহ.)-এর উক্তি শুনেছি। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের সময়ের রুটিন তৈরি করেনি, সময়ের হিসাব রাখেনি, কোথায় ব্যয় হচ্ছে তার সময়– এমন কোনো বোধ দ্বারা তাড়িত হয়নি, তাহলে সে বাস্তবে কোনো মানুষ নয়। আল্লাহ আমাকেও আমল করার তাওফীক দিন এবং আপনাদেরকেও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গুরুত্ব থাকলে সময় পাওয়া যায়

আমার একজন ওস্তাদ নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন। হযরত মাওলানা খায়ের মাহমুদ (রহ.) হযরত থানবী (রহ.)-এর একজন খলীফা ছিলেন। একবার অভিযোগের সুরে আমাকে বললেন : তুমি কোনো সময় আমার কাছে আসো না, যোগাযোগও রাখো না, চিঠিপত্রও দাও না। আমি বললাম : হযরত! সময় পাই না। হযরত বললেন : সময় পাও না? এর অর্থ হলো, অন্তরে এ কাজের গুরুত্ব নেই। কারণ, মানুষের অন্তরে যে কাজের গুরুত্ব থাকে, তার জন্য যেভাবেই হোক সময় বের করে নেয়। যে বলে, অমুক কাজ করার সময় পাইনি, তাই করতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে সে কাজের গুরুত্ব তার অন্তরে নেই। অন্তরে কাজটির গুরুত্ব থাকলে অবশ্যই সময় বের হয়ে যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রাধান্য পায়

সব সময় একটা কথা মনে রাখবে, অনেক কাজ জমা হয়ে গেলে করতে হয় একটি কাজই। মানুষ সব কাজ একসঙ্গে করতে পারে না। অন্তরে যে কাজের গুরুত্ব বেশি, মানুষ সর্বপ্রথম সে কাজটা করে অথবা কোনো ব্যক্তি একটা কাজে ব্যস্ত, ঠিক এ সময়ে এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ সামনে এলো। তখন সে প্রথম কাজটি রেখে দ্বিতীয় কাজটি শুরু করে দেবে। এর অর্থ হলো, যে কাজের গুরুত্ব যত বেশি, সে কাজের কদরও তত বেশি। মানুষ সে কাজটিকে প্রাধান্য দেবে, অন্য কাজ ফেলে রাখবে। যেমন আপনি কোনো কাজ করছেন। কাজটিতে খুব ব্যস্ত আছেন। এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এলো, এ মুহূর্তে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আপনি তখনও কি বলবেন যে, আমি খুব ব্যস্ত, আমার সময় নেই? নিশ্চয় এটা বলবেন না। এজন্য বলবেন না, যেহেতু আপনার অন্তরে তার গুরুত্ব আছে। বোঝা গেলো, অন্তরে গুরুত্ব থাকলে 'সময়' সেখানে বাধা হতে পারে না। সুতরাং নেক কাজকে ফেলে রাখা, সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, এর অর্থ হলো, অন্তরে নেক কাজের গুরুত্ব নেই। যেদিন অন্তরে গুরুত্ব আসবে, সেদিন অবশ্যই সময় বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তোমার হাতে শুধু আজকের দিনটা আছে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

فَاِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدٍ فَاِنْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ

'আজকের দিনটা তোমার জন্য নিশ্চিত। আগামী কাল তোমার জন্য অনিশ্চিত।'

কেউ কি নিশ্চিত বলতে পারে যে, আগামী কাল অবশ্যই সে পাবে? আগামী কালের নিশ্চয়তা কারো কাছে পাবে না। সুতরাং অপরিহার্য কাজ আজই করে নাও। আগামী কাল পাবে কি পাবে না, সেটা তুমি জানো না। সুতরাং প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে হবে এখনই। আগামী কাল যখন আসবে, তখন আগামী কালের বেলায় এমন ধারণাই করো। অর্থাৎ– প্রতিটি দিনকে মনে করো জীবনের শেষ দিন।

এটাই আমার শেষ নামায হতে পারে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামায এমনভাবে আদায় করো, যেমনভাবে আদায় করে ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে আখেরী বিদায় নিতে যাচ্ছে। অর্থাৎ– যে ব্যক্তি জেনে গেছে, এটাই আমার শেষ নামায। দ্বিতীয় আরেকটি নামায আর আমার নসীব হবে না। এমন ব্যক্তি যে রকম গুরুত্ব ও একাগ্রতাসহ নামায পড়বে, তুমিও এভাবে নামায পড়ো। প্রতিটি নামাযকে মনে করো জীবনের শেষ নামায। কারণ, দ্বিতীয় আরেকটি নামায পাবে কিনা, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। [ইবনে মাজাহ]

এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহ.) একটা কথা বলেছেন যে, ঈমান ও ইয়াকীনের স্তর কোনো মুসলমানের অজানা নয়। আজ তো নিশ্চিত যে, কারো কাছে আগামী কালের খবর নেই। কিন্তু যার কাছে আমল নেই, তার কাছে এর গুরুত্বও নেই। আমলবিহীন ইলমের কোনো দাম নেই। প্রকৃত ইলম তো সেটাই, যা মানুষকে আমলের প্রতি তাড়িত করে।

আসলে বুযুর্গদের কথায় বরকত আছে। সত্যিকারের তলব নিয়ে তাদের কথাগুলো অধ্যয়ন করলে আমলের জযবা বাড়ে। আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

সারকথা

আজকের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অমূল্য সম্পদ মনে করতে হবে। এর মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর যিকির ও ইবাদতে কাটানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। অলসতা থেকে বাঁচতে হবে। অর্থহীন গল্প-গুজব থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কবি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন–

یہ کہاں کا فسانہ سود وزیاں

جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا

کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم
جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

অতীত লাভ-ক্ষতির কাহিনী, আলোচনায় এনে লাভ কী? যা চলে গেছে, তা তো চলেই গেছে। আর যা মিলেছে, তা-ই মিলছে। এ নিয়ে আফসোস করে ফায়দা নেই। অতীতকে টেনে এনে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ভবিষ্যতের কথা ভাবো। ভবিষ্যতের ভাবনা ছেড়ে অতীত নিয়ে কান্না কেন?

নিজের হৃদয়কে বলো, জীবনের সময় খুব অল্প। যে সময়টুকু পাচ্ছো, আল্লাহর যিকিরে কাটিয়ে দাও।

আল্লাহ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন। জীবনের মূল্যবান সময়কে যিকিরে, ইবাদতে এবং আখেরাতের ভাবনায় কাটানোর তাওফীক দান করুন। অনর্থক কাজ হতে বাঁচার এবং আলোচ্য উপদেশের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মানবাধিকারের বেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব চেয়ে বড় Contribution হলো, তিনি মানবাধিকারের সঠিক বুনিয়াদ নির্ধারণ করেছেন। এমন ভিত রচনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, যার আলোকে নিঃসংকোচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। সংরক্ষণ ও অসংরক্ষণযোগ্য মানবাধিকারের শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে এই পৃথিবীতে আর কারো কাছে এমন কোনো গাইডলাইন পাওয়া যাবে না, যার ভিত্তিতে বাস্তব ও অবাস্তব মানবাধিকার সংরক্ষণ নির্ধারণী মাপাকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইসলাম ও মানবাধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মহানবী (সা.)-এর সীরাত আলোচনা

আজ আমাদের সুযোগ এসেছে আনন্দ ও সওয়াব লাভের। কারণ, আজকের মাহফিল তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়েছে। তাই এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। মূলত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকোজ্জ্বল আলোচনার মতো অন্য কোনো বরকতময় আলোচনা আর নেই। কবি কত সুন্দর করেই না বলেছেন–

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

'প্রিয়তমের আলোচনা মিলনের চাইতে মোটেও কম নয়।'

বন্ধুর আলোচনা যেহেতু সাক্ষাতের মতোই, তাই মহান আল্লাহ এই আলোচনাকে এত ফযীলতময় করেছেন যে, প্রিয়নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দরূদ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা দশটি নেকী

নাযিল করেন। এই পুণ্যময় আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মাহফিলে শ্রোতা কিংবা আলোচক হিসেবে উপস্থিত হতে পারা সত্যিই এক সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে এ বরকত অর্জনের তাওফীক দিন।

প্রিয়নবী (সা.)-এর গুণাবলী ও পূর্ণতা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচনা আজকের মাহফিলের আলোচ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্যেই মাহফিলটি অনুষ্ঠিত। সীরাতের বিষয়টি এতো সুবিস্তৃত ও সুবিশাল যে, কেউ সারা রাত শুধু সীরাতের একটি দিক নিয়ে আলোচনা করলেও শেষ হবার নয়। কারণ, মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করার মতো সম্ভাব্য সকল কামালাত ও পূর্ণতা মহান আল্লাহ একীভূত করে দিয়েছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা ও চরিত্রে। সুতরাং কবি যা বলেছেন, সত্যিই বলেছেন। অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির অভিযোগ দেয়া যাবে না মোটেও। কবি বলেন–

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

'হে আল্লাহর রাসূল! ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য, ঈসা (আ.)-এর ফুঁক এবং মূসা (আ.)-এর হস্তদ্বয়ের অলৌকিক শুভ্রতার অধিকারী একই সাথে আপনি। সকল সৌন্দর্য ও রূপের অধিকারী একাই আপনি।'

এটা কোনো অতিশয়োক্তি নয়, কিংবা বাড়াবাড়িও নয়। কারণ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছেন বিশ্ব মানবতার জন্য আকাশচুম্বী মর্যাদা নিয়ে। সেই পবিত্র সত্ত্বার যে দিক নিয়েই আলোচনা করুন, সবই কামাল আর কামাল, পূর্ণতা আর পূর্ণতা। সীরাতের যত উঁচু মাপেরই আলোচক হোন না কেন, এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে কিংবা এ মহাসাগরের কোনো একটি দিক বয়ান করতে গেলে তাকে অনেকটা হোঁচট খেতে হয়। কারণ, মহামূল্যবান সীরাতের কোনো অংশই চোখ বুঁজে এড়িয়ে যাবার মতো নয় যে।

অধুনা বিশ্বের অপপ্রচার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আমাদের নাপাক মুখ ও জিহ্বা তাঁর নাম নেয়ার উপযুক্ত নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আজ শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নাম নেয়াই নয়; বরং তাঁর পবিত্র সীরাত দ্বারা উপকার ও পথনির্দেশ লাভ করারও সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন। সীরাতের প্রতিটি দিকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি আমার মাখদুম ও শ্রদ্ধার পাত্র মাওলানা জাহেদ আর-রাশেদী সাহেব (দা. বা.) আমাকে সীরাতের 'মানবাধিকার' সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে সীরাতের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি আলোচনা করার জন্য নির্ধারণ করার কারণ হলো, আজ সারা বিশ্বে এই অপপ্রচার ফেনায়িত করা হচ্ছে যে, বাস্তব জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে গেলে Human Rights তথা মানবাধিকার আক্রান্ত হবে। পশ্চিমা বিশ্ব আজ এমন প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে, কেমন যেন মানবাধিকারের ধারণা সর্বাগ্রে তারাই আবিষ্কার করেছে। তারাই যেন মানবাধিকার রক্ষার একমাত্র ধারক-বাহক। নাউযুবিল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শিক্ষায় যেন মানবাধিকারের কোনো সবক নেই। মুহতারাম মুরুব্বী যেহেতু এ বিষয়টি আমার জন্য নির্বাচন করেছেন, তাই তাঁর নির্দেশ পালনার্থে আমার আজকের আলোচনা এর ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো। তবে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝবার জন্য সকলের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ রাখার অনুরোধ রইল। বিষয়টির স্পর্শকাতরতা ও তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করে অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগ সহকারে শোনার আবেদন করছি। আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা দান করুন।

মানবাধিকারের ধারণা

প্রশ্ন জাগে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলোকে মানবাধিকারের কোনো 'ধারণা' ইসলাম ধর্মে রয়েছে কি-না? এ অদ্ভুত প্রশ্ন সৃষ্টির রহস্য হলো, বর্তমান যুগে পরিকল্পিতভাবে প্রথমে কিছু বিষয়কে 'হিউম্যান রাইটস' বা মানবাধিকার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর চিহ্নিত সে অবকাঠামোর আলোকে মানবাধিকার নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করে তারপর তারা মাপতে শুরু করে ইসলাম এই অধিকার সমর্থন করে কি-না? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব অধিকার নিশ্চিত করেছে কি-না? ইসলাম যদি এসব অধিকার সমর্থন করে কিংবা অনুমোদন দেয়, তাহলে আমরা মেনে নেবো, অন্যথায় আমরা মানতে প্রস্তুত নই। কিন্তু এসব গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনাদের ধারণায় অঙ্কিত মানবাধিকারের যে চিত্র রয়েছে, তা কিসের ভিত্তিতে রচিত? কিসের উপর ভিত্তি করে আপনারা তা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন?

মানবাধিকার পরিবর্তনশীল

মানবজাতির ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন- মানবেতিহাসের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানবাধিকারের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। এক যুগে যা মানবাধিকার বলে চিহ্নিত ছিল, পরবর্তী কোন এক যুগে তা আবার পরিত্যক্ত হয় খড়-কুটোর মতো। পৃথিবীর একাংশে মানবাধিকার বলে স্বীকৃত বিষয়টি অন্য ভূখণ্ডে অনধিকারচর্চা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। মানবেতিহাসের প্রতি চোখ বোলালে দেখা যাবে যে, মানুষের আবিষ্কৃত কোনো রূপরেখা বা মতাদর্শের যথাসাধ্য প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা করেও তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না; বরং তা নিক্ষিপ্ত হয় হতাশার অতলান্ত খাদে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুর্যোগময় সময়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, সে যুগেও মানবসমাজে মানবাধিকারের নামে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। সে যুগের ধারণামতে, দাসপ্রথায় মনিবের কর্তৃত্ব কেবল দাস-দাসীর জান-মালের উপরই ছিল না; বরং মনিবের মৌলিক অধিকার হিসেবে মানবীয় যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া হতে দাস-দাসীকে বঞ্চিত করা হতো। মনিবের মৌলিক অধিকার ছিল, সে চাইলে গোলামের গলায় শিকল পরিয়ে দিতে পারতো কিংবা চাইলে জিঞ্জিরের কড়ায় তাদের পা আবদ্ধ রাখতে পারতো। এটা ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত একটি মানবাধিকার-ধারণা।

সে যুগের মানুষেরা এই অমানবিক কার্যক্রমকে আইনী বৈধতার পোশাক পরানোর লক্ষ্যে যুক্তি ও দর্শনও পেশ করেছিল। একটু চেষ্টা করলে সে লেটারেচর আপনারাও পেয়ে যেতে পারেন। হয়ত আপনি বলবেন, এটা তো চৌদ্দশ' বছর পূর্বের প্রাচীন কথা। তাহলে আজ থেকে মাত্র এক-দেড়শ' বছর পূর্বের কথাই শুনুন, যখন জার্মান ও ইটালিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ মাথা তুলেছিল। মতবাদ দু'টি অবশ্য বর্তমানে গালিতে পর্যবসিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তাদের দুর্নাম। কিন্তু যে দর্শনের ভিত্তিতে এ মতবাদ দুটির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এবং তৎসংক্রান্ত যেসব যুক্তি তারা পেশ করেছিল, আপনি শুধু বিজ্ঞ ভঙ্গিতে তা প্রতিহত করতে চাইলে বিষয়টি সহজ হবে না। তারা মানুষের কাছে এ দর্শন পেশ করেছিল যে, দুর্বলদের শাসন করা সবলদের মৌলিক অধিকার। আর দুর্বলদের দায়িত্ব হলো, তারা শুধু সবলদের কাছে মাথা নত করে সবলদের কর্তৃত্ব মেনে নিবে। এটা তো মাত্র একশ'-দেড়শ' বছর পূর্বের কথা। অতএব, বলা যায়, মানবীয় চিন্তার ইতিহাসে মানবাধিকারের ধারণা এক ধরনের থাকেনি, বরং তা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। 'অধিকার' চিহ্নিত করার বেলায় যুগে

যুগে বিপরীতধর্মী চিত্র দেখা যায়। সুতরাং আজিকার বিশ্বে মানবাধিকারের নামে যা বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য শোরগোল করা হচ্ছে, যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলাই যেন দণ্ডনীয় অপরাধ; সেগুলোর ব্যাপারে এ গ্যারান্টি আছে কি-না যে, তা আগামী দিনে পরিত্যাজ্য হবে না? সেসবের বেলায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন যে আসবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সেগুলোর চিরস্থায়ী বৈধতার প্রমাণ ও সংরক্ষণের কোনো ভিত্তি কি বিদ্যমান?

মানবাধিকারের সঠিক নির্ণয়

মানবাধিকারের বেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব চেয়ে বড় Contribution হলো, তিনি মানবাধিকারের সঠিক বুনিয়াদ নির্ধারণ করেছেন। এমন ভিত রচনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, যার আলোকে নিঃসঙ্কোচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। সংরক্ষণ ও অসংরক্ষণযোগ্য মানবাধিকারের শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে এই পৃথিবীতে আর কারো কাছে এমন কোনো গাইডলাইন পাওয়া যাবে না, যার ভিত্তিতে বাস্তব ও অবাস্তব মানবাধিকার সংরক্ষণ নির্ধারণী মাপাকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে।

মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী একটি সংস্থা

একটি মজার গল্প শুনুন। কিছুদিন পূর্বের কথা। মাগরিবের পর আমি আমার বাসায় অবস্থান করছিলাম। জনৈক আগন্তুক সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আমার নিকট কার্ড পাঠালেন। কার্ড দেখে বুঝলাম, বিশ্বের প্রসিদ্ধ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা 'অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর জনৈক স্কলার প্যারিস থেকে এসেছেন পাকিস্তানে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, 'অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' তো সেই সংস্থা, যা সারা বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণ, স্বাধীন মতামত প্রকাশ লেখনীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করণের পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে অত্যধিক পরিচিত।

পাকিস্তানের শরীয়াহ অধ্যাদেশ ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এই সংস্থাটি ধারাবাহিক প্রতিবাদ, মিছিল-মিটিং করেছিল। যাক ভদ্রলোক পূর্বে সময় নিতে না পারা ও সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আগে অবহিত করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার সংস্থা আমাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' ও 'মানবাধিকার' বিষয়ে জরিপ চালানোর দায়িত্বভার দিয়েছে। এ সুবাদে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মতামত জরিপপূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরি করা আমার কাজ। প্যারিস থেকে

আসার উদ্দেশ্য আমার এটাই। সুতরাং আপনি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে রিপোর্ট তৈরির কাজটি আমার জন্য সহজ হবে।

বর্তমানের সার্ভে

আমি পাল্টা প্রশ্ন করে ভদ্রলোকের নিকট জানতে চাইলাম, 'আপনি কবে এসেছেন?' বললেন, 'গত কাল।' বললাম, 'আপনার পরবর্তী প্রোগ্রাম কি?' তিনি বললেন, 'আগামী কাল করাচি থেকে ইসলামাবাদ ফিরে যাবো।' প্রশ্ন করলাম, 'সেখানে কয়দিন থাকবেন?' বললেন, 'দুইদিন।' 'তারপর?' উত্তর দিলেন, 'তার পর মালেয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে চলে যাবো।' এবার আমি বললাম, 'আপনি গত কাল করাচিতে আসলেন, আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে, আগামী কাল সকালে ইসলামাবাদ চলে যাবেন। তো আজ একদিনে কি করাচির মতো এত বড় শহরের জরিপ সম্পন্ন হয়ে গেছে?' আমার কথায় ভদ্রলোক অনেকটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আসলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যথাযথ জরিপ করা তো সম্ভব নয়, তবে আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমার অনেকটা ধারণা হয়ে গিয়েছে।' আমি বললাম, 'আপনি এ পর্যন্ত কতজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন?' বললেন, 'পাঁচজনের। আপনি হলেন ছয় নম্বর ব্যক্তি।' এবার প্রশ্ন করলাম, মাত্র ছয়জনের সাথে সাক্ষাত করে পুরো করাচিবাসীর মতামত যাচাই করতে কি আপনি সক্ষম হয়েছেন? আগামী কাল ইসলামাবাদ গিয়ে একদিনে আরো ছয়জনের সাথে সাক্ষাত করবেন। তেমনি দিল্লীতে গিয়েও দু'দিনে আরো কিছু লোকের উপর সার্ভে চালাবেন। অতএব বলুন তো জনাব, এটা কোন ধরনের জরিপ-পদ্ধতি?' এবার তিনি বললেন, 'আপনার কথা সত্য। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে বিকল্প কোনো পথ আমার কাছে নেই।' বললাম, 'মাফ করুন জনাব, এত সংক্ষিপ্ত সময়ে জরিপের কাজ করার পরামর্শ আপনাকে কোন জ্ঞানী-বাহাদুর দিয়েছেন? সময়-সুযোগ করেই জরিপ কার্য চালাতে হয়। যাতে মানুষের সাথে সন্তোষজনক সময় দিয়ে সঠিক জনমত যাচাই করা যায়। এত সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে জরিপের মতো এত বিরাট কাজ আপনি হাত দিতে গেলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক, তবে আমাকে এতটুকু সময় দিয়েছে বিধায় আমিও অপারগ।' বললাম, 'জনাব! মাফ করবেন, আপনার এই জরিপের স্বচ্ছতার প্রতি আমি প্রবল সন্দিহান। তাই আমি এই জরিপের অংশীদার হতে প্রস্তুত নই। আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা এই কারণে যে, আপনি মাত্র পাঁচ-ছয়জনের মতামত নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলবেন, এটিই সর্ব-সাধারণের মতামত। এই ধরনের ভিত্তিহীন প্রতিবেদনের কি-ইবা মূল্য হতে পারে?'

ভদ্রলোক অনেক চেষ্টার পরেও আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে সক্ষম হননি। তার সীমাতিরিক্ত পীড়াপীড়ির এক পর্যায়ে বলেছিলাম, 'আপনি আমার অতিথি। আপনাকে আমার সাধ্যমত আপ্যায়ন করার চেষ্টা করবো। তবুও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মুক্তচিন্তা মানে কি বল্গাহীন স্বাধীনতা?

অতঃপর আমি বললাম, 'আমার কথায় অযৌক্তিকতার কোনো গন্ধ থাকলে আপনি তা ব্যাখ্যা করে বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিন।' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কথা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। আমি বন্ধুত্বসুলভ দাবি নিয়ে আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশা করছি।' কিন্তু তার কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার সিদ্ধান্তে আমি স্থির থাকি। পরক্ষণে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করবো।' তিনি বললেন, 'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না আবার পাল্টা প্রশ্ন করবেন?'

বললাম, 'সে জন্যই তো প্রথমে অনুমতি চাইছি। অনুমতি না দিলে আমি প্রশ্ন করবো না।' –একথা বলার পর তিনি অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে বললাম, 'আপনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পতাকা হাতে নিয়ে চলেছেন। আমার প্রশ্ন হলো, মত প্রকাশের এই স্বাধীনতা কি সম্পূর্ণ Absalute বা নিরঙ্কুশ? না কোনো শর্তাধীন?' তিনি বললেন, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝিনি।' বললাম, 'আমার কথা তো স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো, চিন্তার স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে প্রচার আপনারা করছেন– তার অর্থ কি এই যে, যার যা ইচ্ছা তা-ই বলবে, প্রচার করবে, অন্যকে তার প্রতি আহ্বান জানাবে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না –এটাই কি আপনার উদ্দেশ্য? সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বলুন, কেউ যদি ধনীদের ঘরে ডাকাতি করে গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার মত প্রকাশ করে, সে মতও আপনি সমর্থন করবেন কি?' বললেন, 'না, ডাকাতি-লুটতরাজের অনুমতি দেয়া যাবে না।' আমি বললাম, 'এটাই আমার জিজ্ঞাসা। অতএব মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিঃশর্তভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাতে কিছু শর্তারোপ করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।' ভদ্রলোক এবার আমার কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'আরোপিত বা আরোপযোগ্য শর্তের রূপরেখা বা নীতিমালা কী হবে? মত প্রকাশের বৈধতা ও অবৈধতার ভিত্তি ও সীমা নির্ধারণী মাপকাঠি কী হবে? আপনার সংস্থা কি এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কোনো জরিপ পরিচালনা করেছে?' বললেন, 'আপনার পেশকৃত

আলোচনার এ দিকটার উপর ইতোপূর্বে আমরা ভেবে দেখিনি।' আমি বললাম, 'দেখুন জনাব! আপনি এত বড় মিশন কাঁধে নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সমগ্র মানবতার চিন্তার স্বাধীনতা ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করছেন; অথচ আপনি এ মৌলিক বিষয়টি নিয়ে একটুও ভেবে দেখলেন না!' এবার তিনি বললেন, 'যাক, তাহলে আপনিই বলে দিন।' বললাম, 'আমি তো আগেই বলেছি কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না। আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার জন্যই তো আমার প্রশ্ন। .... তো আপনার সংস্থার সংবিধান ও কর্মপদ্ধতির নিরিখে আপনি উত্তর দেবেন– এটাই প্রত্যাশা।'

আপনার কাছে কোনো মাপকাঠি নেই

এবার তিনি বললেন, 'আমি যতটুকু জানি, এ ধরনের কোনো কিছু আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি। তবে আমার মতে যে ধরনের মত প্রকাশের মাধ্যমে ভাইল্যানস তথা অন্য কারো প্রতি বর্বরতা প্রদর্শন করা হয়, তা কখনও সাপোর্ট করা যায় না।' তাঁর উত্তর শুনে আমি বললাম, 'এটা আপনার ধারণার ভিত্তিতে আপনি একটি কথা বললেন, অন্য কারো মাথায় ভিন্ন চিন্তা-ধারণাও আসতে পারে। আপনি আপনার মতের বৈধতার চেষ্টা করবেন, তারা তাদের মতের বৈধতার চেষ্টা করবে। এবার বলুন, কোন ধরনের নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত হবে? কোন ধরনের স্বাধীনতার নিষেধাজ্ঞা বা শর্তারোপ করা হবে? আর কোন ধরনের স্বাধীনতা চলতে থাকবে লাগামহীনভাবে? –এজন্য তো নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি থাকতে হবে।' এবার ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার সাথে আলাপের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমার বিবেকে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। আমার সংস্থার স্কলারদের কাছে এই প্রশ্ন পেশ করবো এবং উত্তরে এ বিষয়ে কোনো লেটারেচর হাতে আসলে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিবো।'

বললাম, 'সুন্দর কথা। আমিও আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো। এ বিষয়ে কোনো মাপকাঠি, যুক্তি-দর্শন আপনি উত্থাপন করতে পারলে আমি একজন ছাত্র হিসেবে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো।' ভদ্রলোকের বিদায়বেলা আবারও বললাম, 'আপনি বিষয়টি উপহাস মনে করে উড়িয়ে দেবেন না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলছি, এ বিষয়ে আপনারা গবেষণা করুন। অবশ্য আপনাদেরকে বলে রাখতে পারি– আপনাদের সব তন্ত্র-মন্ত্র, যুক্তি-দর্শন কাজে লাগিয়েও এমন সর্বজনসমাদৃত কোনো ফর্মুলা প্রস্তুত করতে পারবেন না।' তারপর আজ দেড় বছর হয়ে গেল এ পর্যন্ত কোনো উত্তর তারা দিতে পারেনি।

মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা, বক্তৃতা ও লেখনীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার স্লোগান যতই ফেনায়িত করা হোক না কেন, সারা বিশ্বে এককভাবে সমাদৃত, গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত কোনো নীতিমালা কারো হাতে নেই, থাকতে পারে না। কারণ, সকলের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা এক নয়। নিজস্ব জ্ঞান-ভাবনার ঝুলি থেকে যা বের করবে, তা অন্যের জ্ঞান-ভাবনার সাথে সংঘাত বাঁধা স্বাভাবিক। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, দলের সাথে দলের মতপার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিংবা মানব-উদ্ভাবিত সেসব মত ও ভাবনা কালের বিবর্তনে রহিত বা পরিবর্তনও হয়ে যেতে পারে। এ সংঘাত ও তারতম্যের সমাপ্তি ঘটানোর কোনো পথ নেই। কারণ, মানবীয় জ্ঞানের একটা সীমাবদ্ধতা বা Limitation আছে, আছে তার নির্দিষ্ট চৌহর্দি ও সীমারেখা। সীমারেখা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমগ্র মানবের জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে বড় অবদান হলো, তিনি এসব সমস্যার সমাধানকল্পে যে ভিত রচনা করেছেন, তা নিজ কল্পনাপ্রসূত বুদ্ধির জোরে নয়; বরং রচনা করেছেন সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে। তাই তিনিই বলতে পারেন, কোন ধরনের মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণযোগ্য আর কোনটা সংরক্ষণের অযোগ্য। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ তার প্রকৃত ও সুস্থ সমাধান দিতে পারে না।

ইসলামে তোমাদের প্রয়োজন নেই

যারা ইসলামপ্রদত্ত অধিকার পছন্দসই ও মনমাফিক হলে মানবে, অন্যথায় মানবে না– তাদের উদ্দেশে বলবো, ইসলামের তোমাদের প্রয়োজন নেই। নিজের পছন্দমতো অধিকার লাভের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে ইসলামে তা নিশ্চিত আছে কি-না সে অন্যায় আবদারের আলোকে ইসলামকে মানবে যারা তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, মনে রেখো, তোমার প্রয়োজন ইসলামের নেই। ইসলাম এত ঠেকায় পড়েনি। ইসলাম কারো রিপু চরিতার্থ করার মেলা নয়। ইসলামের অর্থ হলো, প্রথমে নিঃশর্ত আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের উজ্জ্বল সমাধানের আলোকে নিজের সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। এভাবে সত্যিকার অর্থে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করলেই ইসলাম সে নবাগতকে স্বাগতম জানায়, সঠিক পথ দেখায়। ইসলামের পথপ্রদর্শন ও হিদায়েত খোদাভীরুদের জন্যে। সত্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশী ব্যক্তি নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা প্রকাশের মাধ্যমে মহান

আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথ দেখাবেন। যে পথে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি মিলবে।

পক্ষান্তরে অধুনা বিশ্বের চলমান ফ্যাশনাবল চরিত্র ইসলাম গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতকে ইসলামের দাওয়াত ও সত্যের পয়গাম প্রচার করার সময় কোথাও একথা বলেননি, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করলে অমুক অমুক অধিকার পাবে। বরং তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করছি। হে মানবজাতি! বলো– আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তোমরা সফলকাম হবে।' সুতরাং ভোগবাদী লাভ ও সুবিধাপ্রাপ্তি কিংবা রিপু চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে বাস্তবে সে সঠিক পথের নির্ভীক সন্ধানী নয়। সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হলে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা, অপারগতা প্রকাশ করতে হবে। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান এসব বিষয় সমাধান করতে অক্ষম– সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে।

বুদ্ধির সীমারেখা ও কার্যক্ষমতা

আল্লাহ তাআলার দেয়া বুদ্ধি মানুষের জন্য বিশাল সম্পদ। সে মহামূল্যবান সম্পদকে তার নির্দিষ্ট সীমারেখায় পরিচালিত করলে তা দ্বারা অনেক উপকৃত হওয়া যায়। বুদ্ধির সীমারেখা ও কার্যক্ষমতার বাইরে তাকে জোরপূর্বক ব্যবহার করতে চাইলে বুদ্ধি সেখানে খেই হারিয়ে নিশ্চিত ভুলের অবতারণা করবে। মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে মহান আল্লাহ জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন, যাকে বলা হয়– ওহীয়ে ইলাহী বা আসমানী শিক্ষা। পার্থিব জ্ঞানের যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটে, সেখান থেকে আসমানী ওহীর কার্যক্ষমতা শুরু হয়।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের কার্যশক্তি

দেখুন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চক্ষু,কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি দান করেছেন। এসবের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট কার্যপরিধি ও কার্যক্ষমতা রয়েছে। চোখ দেখতে পারে– শুনতে পারে না। শ্রবণের কাজে কেউ চোখকে ব্যবহার করলে সে হবে বোকা। এমনিভাবে প্রতিটি ইন্দ্রিয়শক্তির কার্যক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, যার বাইরে সেই শক্তি কাজ করতে পারে না। আর যেখানে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে, সেখানে পথ চলা শুরু হয় আকল বা বুদ্ধির।

শুধু বুদ্ধি-ই যথেষ্ট নয়

যেমন, আমাদের সামনে রাখা এই চেয়ারটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এটার হাতল হলুদ রঙের। হাতল স্পর্শ করে তার মসৃণতাও অনুভব করলাম। এখন প্রশ্ন জাগে, এই চেয়ারটি কি কেউ তৈরি করেছেন? না-কি এমনিতেই সৃষ্ট? প্রস্তুতকারী মিস্ত্রী এখানে অনুপস্থিত বিধায় কর্ণ, চক্ষু, হাত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। এ স্তরের জন্য আল্লাহ তাআলা দান করেছেন আকল বা বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করে আমি বলে দিতে পারি, ঝকঝকে তকতকে এই চেয়ারটি নিশ্চয় কেউ তৈরি করেছেন। এমন একটি বস্তু এমনিতে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এবার আরেকটু অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন জাগে, এ চেয়ারটি কোন কাজে ব্যবহার করলে কল্যাণকর হবে আর কোন কাজে হবে অকল্যাণকর। এই পর্যায়ের সৃষ্ট প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা যা দান করেছেন, তার নাম হলো ওহীয়ে ইলাহী বা আসমানী শিক্ষা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এই ওহী মানুষের লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ সবকিছুর সমাধান দিতে পারে। যেখানে বুদ্ধির ক্ষমতা নিস্তেজ হয়ে যেতে বাধ্য, সেখান থেকে ওহীর কাজ ও পথনির্দেশনা আরম্ভ হয়। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আরোপিত আদেশ-নিষেধ নিজের বিবেক-বুদ্ধি বা জ্ঞানে বুঝে না আসলেও তা নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। এখানে বুদ্ধির ঘোড়া দাবড়ানো চলবে না। এখানে মানবীয় বুদ্ধির গণ্ডি শেষ হেতু ওহীর গাইডলাইনের ব্যবস্থা করে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাহায্য করেছেন। সবকিছুর সমাধান শুধু যদি বুদ্ধির মাধ্যমে করা যেতো, তাহলে ওহীর প্রয়োজনীয়তা আর থাকতো না। কিতাব, রাসূল, নবী, দ্বীন-ধর্ম কোনো কিছুরই আর প্রয়োজন হতো না। আজকাল অনেকে শরীয়তের বিধি-বিধানকে মানবরচিত যুক্তি-দর্শন ও বুদ্ধির আয়নায় যাচাই-বাছাই করার দুঃসাহস দেখায়। বস্তুত এটা অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং দ্বীনের হাকীকত সম্পর্কে মূর্খতার প্রমাণ।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আরেকটি জটিল প্রশ্নের সমাধানও পাওয়া যায়, যে প্রশ্নটি বর্তমানে অনেকের মাঝেই উঁকি দেয়। প্রশ্নটি হলো, পবিত্র কুরআনে চন্দ্রাভিযানের কোনো শিক্ষা, মহাকাশ পাড়ি দেয়ার কোনো ফর্মুলা নেই কেন? বিজাতীরা যেসব ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে আর আমরা শুধু কুরআন নিয়ে বসে আছি। সে পথে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। –এই প্রশ্নের উত্তর হলো, চন্দ্রাভিযান ও মহাকাশ জয় করা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপার। জ্ঞান-বুদ্ধি, চেষ্টা-গবেষণার গতিকে আরো গতিশীল করে যতই তুমি সামনে

এগোবে, ততই তোমার জন্য নিত্যনতুন আবিষ্কারের পথ উম্মুক্ত হবে। এসবের জন্য আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল ও ওহীর প্রয়োজন নেই।

অধিকার সংরক্ষণের রূপরেখা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিটি অধিকার অতীব গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিত করেছেন। অধিকারের নামে অনধিকার চর্চার কোনো সুযোগ তিনি রাখেননি। তিনি প্রথমে মানবাধিকারের ভিত্তি ও রূপরেখা নির্ধারণ করেছেন। তারপর মানুষের প্রাপ্য প্রতিটি অধিকার দান করেছেন। তদুপরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে সে অধিকারের উপর আমল করেছেন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। অধুনা বিশ্বে মানবাধিকারের দোহাই দাতার কমতি নেই, অনেকে আবার Ricognig করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান দাতাদের স্বার্থের অনুকূলে থাকলে তখন তথাকথিত সেই 'মানবাধিকার' বাহবা পায়, তাকে নিয়ে হৈ-হল্লা হয়। আবার তাদের স্বার্থ হাসিল ও লুটতরাজের পথে মানবাধিকারকে বাধা মনে করলে সাথে সাথে সুর পাল্টিয়ে ফেলে এবং তখন মানবাধিকার পরিপন্থী অমানবিক কাজ করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। তখন তারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মানবাধিকার ও মানবতাকে পদদলিত করে বিশ্ব সভ্যতাকে বিষিয়ে তোলে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি

মানবাধিকারের একটি বিধান হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনা। ইদানিং আমেরিকার একটি গ্রন্থ The and of History and the Lastman বিশ্বে খুব সমাদৃত হচ্ছে। প্রতিজন শিক্ষিত মানুষের টেবিলে গ্রন্থটি স্থান পাচ্ছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসভ্যতার সমাপ্তি ঘটবে। মানবতার সফলতা ও কল্যাণের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাইতে উন্নত আর কোনো মতবাদ হতে পারে না। মনে করুন, আমরা যেমন 'খতমে নবুওয়াত'-এ বিশ্বাসী, ঠিক তেমনি তারা 'খতমে নজরিয়াত' বা মতবাদের পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাসী। তাদের মতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাইতে উন্নত আর কোনো ইজমের অবকাশ নেই।

তারা একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের কথা বলেন, অথচ সে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলজেরিয়ার সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হলে হয়ে যায় গণতন্ত্র বিরোধী বা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাহলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, স্লোগান দেয়া সহজ; কিন্তু সেমতে আমল করা বড় কঠিনই বটে।

একদিকে আজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার স্লোগান দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করে মানবজাতির উপর জুলুমের স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, সেসব পাশবিকতার কথা মুখে আনতে গেলে জিহ্বা কেঁপে ওঠে। আর যে জুলুম ও বর্বরতার নেতৃত্ব দিচ্ছে মানবাধিকারের পতাকাবাহী শক্তিধর সব জালিমগোষ্ঠী। মুখে মানবাধিকারের তাসবীহ পড়লে আর সে বিষয়ে একটি ফিরিস্তি লিখে দিলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। সে কাজ বাস্তবতায় পরিণত করে দেখানো এক কঠিন ব্যাপার। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কথার চাইতে কাজ করেছেন বেশি।

ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না

ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের নাম বদর। বদর যুদ্ধের সময় সাহাবী হযরত হুযায়ফা ও তাঁর পিতা মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করছিলেন। পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো আবু জেহেল বাহিনী। অবশেষে মদীনায় গিয়ে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিবে না- এই শর্তে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। সাহাবীদ্বয় এমন কঠিন মুহূর্তে মদীনায় উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন বদর যুদ্ধের জনশক্তি সংগ্রহ করা হচ্ছিল এবং প্রতিটি মানুষের মূল্য ছিল কয়েক শতের তুল্য। বদর যুদ্ধের ইতিহাস, সে যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সে যুদ্ধে মুসলমানদের অসহায়ত্বের কথা নতুন করে বলতে হয় না। সে যুদ্ধ তো ছিল পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত যুদ্ধ। একদিকে ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত এক হাজার কাফের সৈনিক, অন্যদিকে মাত্র 'তিনশ তেরজন' নিরস্ত্র অসহায় মুসলমান। মুসলমানদের কাছে মাত্র আটটি তরবারী, দুটি ঘোড়া, সত্তরটি উট-এর চাইতে বেশি কিছু ছিল না। কারো কারো হাতে হয়ত লাঠি বা পাথর ছিল যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে। সে কঠিন মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের মূল্য ছিল বর্ণনাতীত। তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন নবাগত দুই মুসলমানকে জিহাদে শরীক করে নেয়ার জন্য। পিতা-পুত্রও ছিলেন জিহাদে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। আবু জেহেল বাহিনীকে দেয়া অঙ্গীকার সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম যুক্তিযুক্ত দলীল পেশ করে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকরা এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অঙ্গীকার নিয়েছে; সুতরাং এদেরকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলে ভালো হয়।' হক-বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ধারণের সে বিপদসংকুল মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, 'না, তোমরা যেহেতু আবু জেহেলদের সাথে যুদ্ধ না করার শর্তে মদীনায় এসেছ, তাই তোমরা জিহাদে শরীক হতে পারবে না। মুমিনের শান ওয়াদা রক্ষা করা– ওয়াদা ভঙ্গ করা নয়।'

সুন্দর সুন্দর মুখরোচক স্লোগান দেয়া সহজ, কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হলে নীতি-নৈতিকতা ও সততার উপর অটল থাকা সহজ নয়। মুখে বলে আমরা মানবাধিকারের ঝাণ্ডাবাহী আর নিজের মতের একটু বিরোধী হওয়াতে একই মুহূর্তে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেয়া, লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান, হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু ও অবলা নারী হত্যা করা– এটাও কি মানবাধিকার!!!

মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য শুধু মুখরোচক স্লোগান আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি। অহেতুক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় তিনি সময় নষ্ট করেননি। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করেছেন, রক্ষা করেছেন অঙ্গীকার।

এবার শুনুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যা তিনি যথাযথভাবে আমল করে দেখিয়েছেন।

ইসলামে প্রাণের নিরাপত্তা

মানুষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে প্রাণের অধিকার। প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্ব ইসলাম যথাযথভাবেই দেয়। অন্যায়ভাবে কেউ কারো জীবন বিপন্ন করতে পারবে না। যুদ্ধ-উত্তেজনার মুহূর্তেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বৃদ্ধ, শিশু, পীড়িত ও নারীদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এটা মৌখিক কোনো বুলি নয়; বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তা বাস্তবায়ন করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কোনো নারী, শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধের উপর তাঁরা কখনো হাত তোলেননি। আজকাল যারা মানবাধিকারের বুলি আওড়াতে আওড়াতে নাকে-মুখে ফেনা তোলে, তারা-ই তো মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার নিষ্পাপ মানবসন্তানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

ইসলামে সম্পদের নিরাপত্তা

সম্পদের হেফাযত ও নিরাপত্তা বিধান মানুষের দ্বিতীয় মৌলিক অধিকার। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভোগ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম। একদিকে নিষিদ্ধ করে আবার অন্যদিকে ছল-চাতুরি ও হিলা-অপব্যাখ্যা করে

কারো সম্পদ কুক্ষিগত করার অনুমতি ইসলামে নেই। কারো সাথে বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা থাকলে তার সম্পদ রক্ষা করলাম আর কারো সাথে সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হলে, মনোমালিন্য ও ঝগড়া বাঁধলে তার ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করে দিলাম– এ ধরনের জুলুমবাজী ইসলাম সমর্থন করে না।

খায়বার যুদ্ধের সময়ের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে আছেন। এমন সময় একজন অমুসলিম রাখাল মনিবের ছাগলপালসহ প্রবেশ করলো মুসলমানদের সেনাছাউনিতে। তার প্রচণ্ড স্পৃহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার। তাই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় অবস্থান করছেন– জানতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম সঠিক তথ্য দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু সে তথ্য রাখালের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। এত বড় একজন মহান নবী খেজুর পাতার একটি কুঁড়েঘরে অবস্থান করবেন– কথাটি সে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বারবার একই উত্তর আসায় সে ইতস্তত ভঙ্গিতে তাঁবুতে ঢুকল। তাঁবুতে প্রবেশ করে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর আনীত দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাইল। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের কথা বললেন। রাখাল প্রশ্ন করল, 'হুযূর! আপনার ধর্ম মেনে নিলে আমার কী লাভ হবে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কালিমা পড়লে আমি তোমাকে আমার বুকে তুলে নেবো। তুমি হয়ে যাবে আমার ভাই। আর তোমার অধিকার হবে অন্য সকল মুসলমানের অধিকারসম।' একথা শুনে রাখাল বলল, 'আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন কি? আমি একজন কুৎসিত রাখাল। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমার স্বজনরা আমাকে সমাজে ঠাঁই দেয় না। আমাকে সবাই তুচ্ছ মনে করে। আর আপনি আমাকে বুকে তুলে নেবেন?'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান, তাই মুসলমান হলে তোমাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরবো, তোমার সাথে কোলাকুলি করবো।' রাখাল পুনরায় প্রশ্ন করল, 'আমি মুসলমান হলে আমার পরিণাম কী হবে?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই যুদ্ধে তুমি মারা গেলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ তাআলা তোমার কৃষ্ণতাকে আলোকজ্জ্বল করে দেবেন। তোমার দুর্গন্ধ শরীরকে সুশোভিত করে দেবেন।' –একথা বলতেই লোকটি কালিমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করলো। ইসলাম গ্রহণের পর তার করণীয় কী– জানতে চাইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এখন নামায-রোযার সময় নয়, তাই

তোমার সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো– তুমি মনিবের আমানত ছাগলগুলো তার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরবর্তী আমলের শিক্ষা নাও।'

জানেন কি, এই ছাগলগুলোর মালিক কে ছিল? এগুলোর মালিক ছিল এমন কিছু ইহুদী, যাদের সাথে যুদ্ধ চলছিল। যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিষ্পেষিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার হঠকারিতা, কূটকৌশল ও অপকর্ম করে আসছিল। এতদসত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দেখুন; অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম নমুনা দেখুন; জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের গ্যারান্টির প্রতি লক্ষ্য করুন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ প্রতিপক্ষের ছাগলের পাল পৌঁছিয়ে দেয়ার দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ তিনি দিচ্ছেন। নওমুসলিম রাখাল বলল, 'হুযূর! এগুলো সেই পাপিষ্ঠ ইহুদীদের ছাগল, যারা আপনার রক্তের পিপাসু।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাই হোক না কেন, তুমি আগে তাদের ছাগল তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো।' শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হলো। দুনিয়ার কোনো লিডার, মানবাধিকারের ধজাধারীদের জীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানেও আবেগতাড়িত হননি। নিজের ভক্তদেরও কোনো দিন সীমালংঘন করতে দেননি। যাক, ছাগল ফেরত দিয়ে এসে রাখাল বলল, 'হুযূর! এবার আমাকে কী করতে হবে?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এখন কোনো নামাযের সময় নয় যে, তোমাকে নামাযের আদেশ করবো। রমযান মাস নয় যে, তোমাকে রোযার কথা বলবো। তুমি ধনীও নও যে, যাকাত দেবে। তুমি এই মুহূর্তে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ো।' অবশেষে লোকটি জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শাহাদাতের গৌরব অর্জন করে জান্নাতবাসী হয়ে গেলো। জিহাদ সমাপ্তির পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অভ্যাস অনুযায়ী শহীদ ও আহতদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ইত্যবসরে তিনি দেখতে পেলেন রণাঙ্গনের এক পাশে সাহাবায়ে কেরামের ভিড়। সেখানে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাহাবায়ে কেরাম একটি লাশ সনাক্ত করার ব্যাপারে বিপাকে পড়ার কথা জানালেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যাকে সনাক্ত করতে পারছো না, আমি তাকে ভালো করেই জানি। আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ পাক তাকে আবে কাউসার আর আবে তাসনীম দ্বারা গোসল দিয়েছেন। তার দেহের কৃষ্ণতাকে শুভ্রতা এবং দুর্গন্ধকে সুগন্ধিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।

যাক, বলতে চাচ্ছি– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু-মিত্র, কাফের-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সম্পদের অধিকার হেফাযত করার বিরল আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

মান-সম্মানের নিরাপত্তায় ইসলামের ভূমিকা

মানুষের তৃতীয় মৌলিক অধিকার হচ্ছে মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা। আর এই নিরাপত্তা বাস্তবায়নকারীর দাবি অনেকেই করে থাকে। কিন্তু সকলের আগে একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন– 'কারো অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা-কুৎসা রটানোও তার সম্ভ্রমহানীর নামান্তর।' অর্থাৎ– নিন্দা তথা গীবত ও কুৎসা রটানো দ্বারাও মানুষের মান-ইজ্জতের হানী হয়। আজকাল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণের স্লোগান অনেকে দেন; কিন্তু কারো গীবত বা পিছনে দোষচর্চা না করার প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। গীবত করা, গীবত শোনা এবং কারো মনে কষ্ট দেয়া সবই হারাম ও কবীরা গুনাহ। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। এক পর্যায়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কাবাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, 'হে বায়তুল্লাহ! তুমি অনেক বড়, অনেক পবিত্র।' অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আবদুল্লাহ! এই কাবা বড়ই পবিত্র ও সম্মানিত, কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে কাবার চাইতে অধিক সম্মানী একটি জিনিস রয়েছে। তা হচ্ছে, একজন মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত। কেউ কারো জান-মাল-ইজ্জতের উপর অন্যায়ভাবে আঘাত করার অর্থ কাবা শরীফ ভেঙে দেয়ার চাইতেও বড় অন্যায়।' –এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সম্মান-ইজ্জত রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

জীবিকা উপার্জনের অধিকার রক্ষায় ইসলাম

মানুষের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনের বিষয়টিও খুব গুরুত্ব রাখে। বিষয়টি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে– 'স্বীয় ধন-সম্পদের প্রভাব খাটিয়ে অন্যের আয়ের পথ রুদ্ধ করার অনুমতি কারো নেই।' আয়ের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে চুক্তির স্বাধীনতা (Freedom of Contract) দিয়েছেন, অন্যদিকে সমাজের জন্য অকল্যাণকর এবং অন্যদের উপার্জনের পথ রুদ্ধকারী সকল উপায়-পদ্ধতি ও চুক্তি তিনি হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

'কোনো শহুরে লোক দূরাগত কোনো বেদুঈনের পণ্য বিক্রি করতে পারবে না।'

অর্থাৎ- গ্রাম থেকে কৃষি উৎপাদিত মাল বা অন্য কোনো সাধারণ পণ্য নিয়ে কেউ শহরে এলে কোনো শহুরে লোক তার আড়তদার কিংবা এজেন্ট হতে পারবে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এতে অসুবিধা কী? উত্তরে বলা হবে, অসুবিধা অনেক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে একথা অনুধাবন করেছেন যে, এই সুযোগ দেয়া হলে শহুরে মানুষগুলো স্টক বা গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করবে এবং ইচ্ছামাফিক মুনাফা অর্জন করবে। যার ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণ গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাবে। ফলে ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের আয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি এসব পদ্ধতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদ খেয়ে, হরেক রকমের জুয়া খেলে, কালোবাজারী করে সম্পদের পাহাড় গড়া এবং সারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতেগোনা কিছু অসৎ ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাওয়া- এটা কখনো ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলাম

মানুষের আকীদা-বিশ্বাস এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলামের বিধান অতুলনীয়। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াত-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।'

একটি মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টান-ইহুদী-হিন্দু-বৌদ্ধ মোটকথা যে কেউ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে- তাতে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই; বরং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অবশ্য মার্জিতভাবে ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যতা বুঝিয়ে জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগ করা যাবে। তবে স্বেচ্ছায় একবার ইসলাম গ্রহণ করলে আর কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া যাবে না। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে ইসলামকে খেলনার পাত্রে পরিণত করে দেয়ার অনুমতি দেয়া যায় না। মুরতাদ তথা ইসলামত্যাগী হওয়ার অর্থ আল্লাহর দ্বীনকে উপহাস করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি

করা, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা। ফ্যাসাদ মানে পঁচন ধরা। আর পঁচনের চিকিৎসা হলো, অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে পঁচনশীল স্থানটি মানবদেহ থেকে সরিয়ে ফেলা। তাই মুরতাদের শাস্তিও অস্ত্রোপচার বা অপারেশন অর্থাৎ- মৃত্যুদণ্ড।

যাক, কারো বুঝে আসুক বা না-ই আসুক, সত্য তো তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো নীতি মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না। ধর্মের বেলায় মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তা আর ছাড়া যাবে না। মুরতাদের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে ইসলামের দুশমনেরা ইসলামকে মালা খেলায় পরিণত করবে। তাই মুসলমান হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করে ইসলাম ত্যাগের দুঃসাহস দেখানোর অনুমতি কারো নেই। এ ধরনের কিছু করার অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে। ইসলামের ঘরে অবস্থান করে ইসলামের সাথে গাদ্দারী করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগ

মানবাধিকার একটি সুদীর্ঘ ও বিস্তৃতি বিষয়। আপনাদেরকে আমি পাঁচটি উদাহরণ পেশ করলাম। জীবন, সম্পদ, মান-ইজ্জত, ধর্ম-বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ- এই হলো মানুষের মৌলিক পাঁচটি অধিকার। এখানে মূল লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে- কথা আর কাজে মিল থাকা। মুখে অনেকেই অধিকার রক্ষার বুলি ছাড়ে, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবায়নকারী হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ। ফারুকে আযম হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলের একটি ঘটনা। তখন বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া বা ট্যাক্স আদায় করা হতো। একবার অত্র এলাকায় মোতায়েনকৃত সেনাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আযম (রা.) বললেন, 'আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করে অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষা করার গ্যারান্টি দিয়েই তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করেছি।' তাই অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে ফারুকে আযম (রা.) বললেন, 'অনিবার্য কারণবশত আমরা আর আমাদের সৈন্য এখানে রাখতে পারছি না। সুতরাং তোমাদের কাছ থেকে আদায়কৃত সমুদয় করের টাকা তোমাদেরকে ফেরত দেয়া হচ্ছে।'

হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর একটি ঘটনা

ইসলামের ইতিহাসে এক মজলুম মানব হলেন হযরত মু'আবিয়া (রা.)। ইসলামের দুশমনেরা সব ধরনের কুৎসা তাঁর বিরুদ্ধে রটিয়েছে। আবু দাউদ

শরীফে তাঁর একটি বিরল ঘটনা পাওয়া যায়। একবার তাঁর সাথে রোমানদের সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, চুক্তির শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে। আর শত্রুসেনার উপর সেই অপ্রস্তুত মুহূর্তে হঠাৎ হামলা করলে বিজয় অর্জন অনেকটা সহজ হবে।

অবশেষে পরিকল্পিতভাবে তিনি করলেনও তাই। চুক্তির মেয়াদের শেষ দিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথেই পূর্বে মোতায়েনকৃত সেনাদের সবুজ সংকেত দিয়ে দিলেন। খুব দ্রুত ও সফলতার সাথে এলাকার পর এলাকা তিনি জয় করে নিচ্ছিলেন। এলাকার পর এলাকা মুসলমানদের পদতলে চলে আসছিল। বিজয়ের এই সয়লাব অনেক অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে দেখা গেল পেছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অশ্ব হাঁকিয়ে এদিকে ছুটে আসছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলছেন–

قِفُوا عِبَادَ اللّٰهِ قِفُوا عِبَادَ اللّٰهِ!

'হে আল্লাহর বান্দারা থেমে যাও, আল্লাহর বান্দারা থামো।'

এ চিৎকার শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেমে গেলেন। এতক্ষণে সাহাবী হযরত আমর ইবনু আবাসা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পৌছে গেলেন এবং দৃঢ়তার সাথে বললেন–

وَفَاءٌ لَا غَدْرَ

'মুসলমানদের আদর্শ অফাদারী করা– গাদ্দারী করা নয়।' হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমি তো কোনো গাদ্দারী করিনি, যুদ্ধবিরতি মেয়াদের সমাপ্তি হওয়ার পরই তো আমি হামলা করেছি।' হযরত আমর ইবনু আবাসা (রা.) বললেন, 'আমি নিজকানে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّهُ وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَلُهُ أَوْ يَنْبِذَ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অর্থাৎ– 'কোনো জাতির সাথে তোমাদের সম্পাদিত চুক্তিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করবে না। খুলবেও না, বাঁধবেও না। যতক্ষণ না তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় কিংবা স্পষ্টভাবে সে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়।' আর আপনি তো চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছেন হয়ত কিছু সৈন্য

তাদের ভূখণ্ডেও অনুপ্রবেশ করিয়েছেন। তাই আপনার আক্রমণ শান্তিচুক্তি বিরোধী হয়েছে। সুতরাং বিজিত ভূখণ্ড আল্লাহ তাআলার মর্জিমাফিক হয়নি। শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা.) সকল সেনা প্রত্যাহার করে ছাউনিতে ফিরিয়ে আনেন এবং বিজিত এলাকা দখলমুক্ত করে রোমনাদেরকে ফিরিয়ে দেন।

মানবাধিকারের বিষয়টি খুবই বিস্তৃত। এ বিষয়টির ইতি সহজে টানা যায় না। মোটকথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবাধিকারের নিশ্ছিদ্র কাঠামো রচনা করেছেন। সংরক্ষণ ও অসংরক্ষণযোগ্য অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করেছেন। মুখে যা বলেছেন, বাস্তবে তা দেখিয়েছেন।

বর্তমানকালের হিউম্যানরাইটস

আজকের পৃথিবীতে মানবাধিকার সংস্থাগুলো লোক দেখানোর জন্য অথবা পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য নানারকম চার্ট তৈরি করেছে। শোরগোল করে সেগুলো বিশ্বময় প্রচার করছে। এই হিউম্যানরাইটস চার্টারের প্রবক্তারা স্বীয় সার্থসিদ্ধির জন্য নিরপরাধ যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করতেও তাদের বিবেকে একটুও বাঁধে না। মজলুমের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও বর্বরতার স্টীমরোলার চালাতে 'মানবাধিকার' তাদের জন্য বাঁধ সাধে না। নিজ সার্থের জন্য এবং অন্যের সম্পদ লুট করার জন্য তারা যেকোনো অপরাধ করতে প্রস্তুত। যেকোনো জঘন্য অন্যায় করার সময় মানবাধিকার ও জাতিসংঘ সনদের কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তাদের সার্থে সামান্য আঘাত এলে অথবা তাদের অন্যায় দাবির বিরোধী হলেই কেবল 'মানবাধিকার-মানবাধিকার' বলে আর্তনাদ করে। এরকম জালিয়াতপূর্ণ মানবাধিকার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠা করেননি। মহান আল্লাহ তাআলা দয়া করে এই সত্য কথাগুলো বুঝবার তাওফীক দান করুন এবং মানবাধিকারের নামে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যেসব প্রোপাগাণ্ডা ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন।

সম্মানিত উপস্থিতি! আমাদের মধ্যে অনেক মুসলমান কুফরীশক্তির প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে অপরাধীর মতো হাত জোড় করে বলে থাকে– ইসলামে অমুক অধিকার নেই, এটা আছে-ওটা নেই। এজন্য তারা পশ্চিমাদের মর্জিমাফিক কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে। জেনে রাখুন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'এসব ইহুদী-খ্রিস্টান ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি নিজ দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়ে তাদের দ্বীন গ্রহণ করবেন।' কিন্তু সঠিক পথ ও হেদায়েত হলো একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়েত। তাই বিজাতীয় চাপ ও হুমকি-ধমকিতে সন্ত্রস্ত না হয়ে ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকাই হবে মর্দে মুমিনের কাজ। অন্যথায় ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা হতাশা ও অনিশ্চয়তার ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্য ও মুক্তির একমাত্র পথ দ্বীন ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"তিনটি যুগ মুসলিম উম্মাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তাবেঈনের যুগ এবং তাবে-তাবেঈনের যুগ। এই তিন যুগেও দেখা গেছে, শবে বরাতকে ফযীলতময় রাত হিসাবে পালন করা হতো। মানুষ এ রাতকে ইবাদতের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতো। সুতরাং একে বিদআত আখ্যা দেয়া অথবা ভিত্তিহীন বলা উচিত নয়। এ রাত ফযীলতপূর্ণ; এটাই সঠিক কথা। এ রাতে ইবাদত করলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ, এ রাতের অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।"

শবে বরাতের হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

হাম্দ ও সালাতের পর!

শা'বান মাস শুরু হয়েছে। এ মাসে শবে বরাত নামক একটি পবিত্র রাত রয়েছে। যেহেতু কেউ কেউ মনে করেন, এ রাতের ফযীলত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ রাতে জাগ্রত থাকা এবং বিশেষভাবে এ রাতের ইবাদতকে সওয়াবের কারণ মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। বরং এগুলো বিদআত। বিধায় এ রাত সম্পর্কে মানুষের মনে বিভিন্ন দ্বিধা ও প্রশ্ন জেগেছে। তাই এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি।

মানার নাম দ্বীন

এ সুবাদে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, যা আমি আপনাদেরকে বারবার বলেছি, তাহলো- যে জিনিস কুরআন অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রমাণিত নয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়- সেটাকে দ্বীনের অঙ্গ মনে করা বিদআত। আর আপনাদেরকে আমি এও বলে এসেছি, নিজের পক্ষ থেকে একটা পথ অবলম্বন করে নেয়ার নাম দ্বীন নয়। বরং মানার নাম হলো দীন। কাকে মানতে হবে? মানতে হবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে, সাহাবায়ে কেরামকে, তাবেঈনকে এবং বুযুর্গানে দ্বীনকে। বাস্তবেই যদি এ রাতের ফযীলত প্রমাণিত না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে রাতটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া বিদআত হবে। যথা শবে মেরাজ সম্পর্কে বলেছিলাম, শবে মেরাজের ইবাদত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

এ রাতের ফযীলত ভিত্তিহীন নয়

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, শবে বরাতের ফযীলত হাদীসে নেই একথা বলা যাবে না। অন্তত দশজন সাহাবা এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য থেকে দু'-একটি হাদীস সনদের বিবেচনায় অবশ্যই দুর্বল। যার কারণে কিছু উলামায়ে কেরাম এ রাতের ফযীলতকে ভিত্তিহীন বলেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে বলেছেন : সনদের বিবেচনায় কোনো হাদীস যদি কমজোর হয়, যার সমর্থনে আরো হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে সেই হাদীস আর দুর্বল থাকে না। আর দশজন সাহাবা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যার সমর্থনে দশজন সাহাবার হাদীস রয়েছে, সেই বিষয়টি আর ভিত্তিহীন থাকে না। তাকে ভিত্তিহীন বলা ভুল হবে।

শবেবরাত এবং খায়রুল কুরুন

তিনটি যুগ মুসলিম উম্মাহর নিকট শ্রেষ্ঠ যুগ। সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তাবেঈর যুগ, তাবে-তাবেঈর যুগ। এ তিন যুগেও দেখা গেছে, শবে বরাত ফযীলতময় রাত হিসাবে পালন করা হতো। মানুষ এ রাতে ইবাদতের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতো। সুতরাং একে বিদআত আখ্যা দেয়া অথবা ভিত্তিহীন বলা উচিত নয়। এ রাত ফযীলতময়; এটাই সঠিক কথা। এ রাতে ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকলে এবং ইবাদত করলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে। এ রাতের অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বিশেষ কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট নেই

এটাও ঠিক যে, এ রাতে ইবাদতের বিশেষ কোনো তরিকা নেই। অনেকে মনে করে থাকে, এ রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায পড়তে হয়। যেমন প্রথম রাকাতে অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। মূলত এগুলোর কোনো প্রমাণ নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা, বরং এ রাতে যত বেশি সম্ভব হয় নফল নামায পড়বে। কুরআন তেলাওয়াত করবে। যিকির করবে। তাসবীহ পড়বে। দুআ করবে। এ সকল ইবাদত এ রাতে করা যাবে। কারণ, এ রাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত নেই।

এ রাতে কবরস্তানে গমন

এ রাতের আরেকটি আমল আছে। একটি হাদীসের মাধ্যমে যার প্রমাণ মিলে। তাহলো এ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়েছিলেন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে এ রাতে গিয়েছেন, তাই মুসলমানরাও এ রাতে কবরস্তানে যাওয়া শুরু

করেছে। কিন্তু আমার আব্বাজান মুফতী শফী [রহ.] বড় সুন্দর কথা বলেছেন, যা সব সময়ে স্মরণ রাখার মতো কথা। তিনি বলেছেন : যে বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেভাবে প্রমাণিত, সেই বিষয়কে ঠিক সেভাবেই পালন করা উচিত। বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনে এক শবে বরাতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি একবার গিয়েছেন, অতএব জীবনে যদি এক শবে বরাতে কবরস্তানে যাওয়া হয়, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি প্রতি শবে বরাতে গুরুত্বের সাথে কবরস্তানে যাওয়া হয়, একে যদি জরুরি মনে করা হয়, একে যদি শবে বরাতের একটি অংশ ভাবা হয় এবং কবরস্তানে গমন করা ছাড়া শবে বরাতই হয় না মনে করা হয়, তাহলে এটা হবে বাড়াবাড়ি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে জীবনের এক শবে বরাতে কবরস্তানে গমন করলে এটা হবে সওয়াবের কাজ। হ্যাঁ, অন্যান্য শবে বরাতেও যাওয়া যাবে। কিন্তু যাওয়াটা জরুরি ভাবা যাবে না, নিয়ম বানিয়ে নেয়া যাবে না। মূলত দ্বীনকে সহীহভাবে বুঝবার অর্থ এগুলোই। যে জিনিস যে স্তরের, সেই জিনিসকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

নফল নামায বাড়িতে পড়বে

শুনেছি, অনেকে এ রাতে এবং কদরের রাতে জামাতের সাথে নফল নামায পড়ে। শবিনার মতো এখন সালাতুত তাসবীহকেও জামাতের সাথে পড়া হয়। মূলত সালাতুত তাসবীহর জন্য জামাত নেই। এটি জামাতের সাথে পড়া নাজায়েয। এ প্রসঙ্গে একটি মূলনীতি শুনুন। মূলনীতিটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাহলো ফরয নামায এবং যেসব নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের সাথে আদায় করেছেন। যেমন তারাবীহ, বিতর এবং ইসতিসকা ইত্যাদির নামায– এ সকল নামায ছাড়া অবশিষ্ট সব ধরনের নামায বাড়িতে পড়া উত্তম। ফরয নামাযের বৈশিষ্ট্য হলো, জামাতের সাথে আদায় করা। ফরয নামাযের ক্ষেত্রে জামাত শুধু উত্তমই নয়; বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর সুন্নাত ও নফল নামাযের বেলায় মূলনীতি হলো, এগুলো আদায় করবে নিজের ঘরে। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম যখন লক্ষ্য করলেন, মানুষ অনেক সময় ঘরে পৌঁছে সুন্নাতকে রেখে দেয়। তারা সুন্নাত পড়ে না, ফাঁকি দেয়। ফুকাহায়ে কেরাম তখন ফতওয়া দিলেন, ঘরে চলে গেলে সুন্নাত ছুটে যাবার আশঙ্কা থাকলে মসজিদেই পড়ে নিবে। সুন্নাত যেন ছুটে না যায় তাই এই ফতওয়া। অন্যথায় মূলনীতি হলো, সুন্নাত ঘরে পড়বে। আর নফল নামাযের বেলায় সকল ফকীহ ঐক্যমত যে, নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। হানাফী মাযহাব মতে নফল নামায জামাতের

সাথে পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। সুতরাং নফল নামায জামাতের সাথে পড়লে সওয়াব তো দূরের কথা; বরং গুনাহ হবে।

ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করবে

প্রকৃতপক্ষে ফরযসমূহ হলো শিআরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শন। আর নামায যেহেতু ফরয, তাই তাকে প্রকাশ্যে জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। কোনো মানুষ যদি মনে করে, মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে 'রিয়া' হবে, অতএব মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া যাবে না– এ ধরনের করা কখনও জায়েয হবে না। কারণ বিধান হলো, ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। কেননা, তার মাধ্যমে শিআরে ইসলামকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং তা মসজিদেই পড়তে হবে।

নফল নামায একাকী পড়াই কাম্য

পক্ষান্তরে নফল এমন একটি ইবাদত, যে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা পরওয়ারদেগারের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কের মাঝে থাকবে তুমি আর তোমার প্রভু। গোলাম আর রবের একান্ত বিষয় এটা। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রা.]-এর ঘটনা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আপনি এত নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন :

أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ (ابو داؤد، كِتَابُ الصَّلَاةِ – الرقم ١٣٢٩)

অর্থাৎ– যে পবিত্র সত্তার সাথে আমি চুপিসারে আলাপ করছি, তাঁকে তো শুনিয়ে দিচ্ছি।' সুতরাং অন্য মানুষকে শুনানোর কী প্রয়োজন?

অতএব নফল ইবাদত নির্জনেই পড়া ভালো। যেহেতু এটা গোলাম আর প্রভুর একান্ত বিষয়। তাই এর মধ্যে কোনো অন্তরায় থাকা কাম্য নয়। আল্লাহ চান, বান্দা যেন সরাসরি তাঁর সাথে সম্পর্ক করে। নফল নামায জামাতের সাথে পড়া কিংবা সম্মিলিতভাবে মাকরূহ এ কারণেই। নফল নামাযের ক্ষেত্রে বিধান হলো, নির্জনে একাকি পড়ো। পরওয়ারদেগারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক কায়েম করো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার। চিন্তা করুন, বান্দার কত শান।

আমার কাছে একাকি এসো

রাজা-বাদশাহর দরবার সাধারণত দু'ধরনের হয়। আম দরবার এবং খাছ দরবার। জামাতের নামায হলো আল্লাহ তাআলার আম দরবার। আর একাকি নফল নামায মানে আল্লাহ তাআলার খাছ দরবার। খাছ দরবার নির্জনে হয়। কারণ, সেখানে পুরস্কারের বিষয়ও থাকে। আল্লাহ বলেন : বান্দা! তুমি যখন

আমার আম দরবারে উপস্থিত হয়েছো, সেজন্য তোমাকে আমার খাছ দরবারেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখন যদি এ খাছ দরবারের গাম্ভীর্য নষ্ট করে দেয়, যদি নির্জন দরবারকে কোলাহলপূর্ণ করে তোলে, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে শোভনীয় নয়। এতে খাছ দরবারের গাম্ভীর্য নষ্ট হবে। তাই আল্লাহর বক্তব্য হলো, নফল নামায একাকি পড়ো, নির্জনে পড়ো, তাহলে তোমাকেও গোপন নেয়ামত দেয়া হবে।

নেয়ামতের অবমূল্যায়ন

যেমন তুমি কোনো রাজা-বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে। বাদশাহ বললেন : আজ রাত নয়টা বাজে আমার সাথে দেখা করবে। সঙ্গে কাউকে আনবে না; তোমার সাথে প্রাইভেট আলাপ আছে। যখন রাত নয়টা হলো। তুমি বন্ধু-বান্ধবের একটা দল বাঁধলে। তারপর সবাইকে নিয়ে বাদশাহর দরবারে গেলে। এবার বলো, তুমি বাদশাহর কথার মূল্যায়ন করলে, না অবমূল্যায়ন করলে? বাদশাহ তোমাকে প্রাইভেট সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ সম্পর্কের আহ্বান করেছিলো। নির্জনে তোমাকে ডেকেছিলো। আর তুমি দলবদ্ধ হয়ে তার অবমূল্যায়ন করলে।

এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলতেন : নফল ইবাদতের সঠিক মূল্য দাও। নফল ইবাদতের সঠিক মূল্য হলো, তুমি থাকবে আর তোমার আল্লাহ থাকবেন। তৃতীয় কেউ থাকতে পারবে না। এটাই নফল ইবাদতের বিধান। নফল ইবাদত জামাতের সাথে করা মাকরূহে তাহরীমী। আল্লাহর আহ্বানের প্রতি লক্ষ করুন–

اَلَا هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ

'আছ কি মাগফিরাতের কোনো প্রত্যাশী যে, তাকে আমি মাফ করতে পারি?'

এখানে مستغفر শব্দটি একবাচক। অর্থাৎ একক ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি? একক রহমত প্রত্যাশী আছ কি? তাহলে আল্লাহ আমাকে, শুধু আমাকে নির্জনে ডাকছেন। অথচ আমি শবিনার ইন্তিজাম করলাম, আলোকসজ্জা করলাম, দলবদ্ধ হলাম, তাহলে এটা কি আসলেই সমীচীন হলো? এটা তো আল্লাহর পুরস্কারের অবমূল্যায়ন হলো।

একান্ত মুহূর্তগুলো

এ ফযীলতময় রাতটি শোরগোল করার জন্য নয় কিংবা সিন্নি-মিঠাই বিলি করার জন্য নয় অথবা সম্মেলন করার জন্যও নয়। বরং এ বরকতময় রাত আল্লাহর সঙ্গে একান্তে সম্পর্ক গড়ার রাত, যে সম্পর্কের মাঝে কোনো অন্তরায় থাকবে না।

میاں عاشق و معشوق رمزیست
کراما کاتبین راہم خبر نیست

'আশেক আর মাশুকের ভেদ কিরামান কাতিবীনেরও অগোচরে থেকে যায়।'

অনেকে অনুযোগের সুরে বলে, একাকি ইবাদত করতে গেলে ঘুম চলে আসে। মসজিদ যেহেতু লোকজনের সরগরম থাকে, আলো-বাতি থাকে, তাই মসজিদে ইবাদত করলে ঘুম আর কাবু করতে পারে না। বিশ্বাস করো, নির্জন ইবাদতে যে কয়েকটি মুহূর্ত কাটাবে, যে স্বল্প সময়ে আল্লাহর সাথে তোমার প্রেম বিনিময় হবে, তা সারা রাতের ইবাদতের চেয়েও অনেক উত্তম। কারণ, এটা তখন সুন্নাত মতে হবে। ইখলাসের সাথে কয়েক মুহূর্তের ইবাদত সারা রাতের ইবাদতের চেয়েও ফযীলতপূর্ণ হবে।

সময়ের পরিমাণ বিবেচ্য নয়

আমি সব সময় বলে থাকি, নিজের বুদ্ধির ঘোড়া চালানোর নাম দ্বীন নয়। নিজ বাসনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। বরং দ্বীনের উপর আমল করার নাম দ্বীন। দ্বীনের অনুসরণ করার নাম দ্বীন। তুমি মসজিদে কত ঘন্টা কাটিয়েছ, আল্লাহ তাআলা এটা দেখেন না। আল্লাহর কাছে ঘন্টার কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করেন ইখলাসের। ইখলাসের সাথে ইবাদত করলে অল্প আমলই ইনশাআল্লাহ নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। সুন্নাহবিহীন আমল যত বিশালই হোক না কেন, তার কোনো মূল্য নেই।

ইখলাস কাম্য

আমার শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) আবেগের আতিশয্যে বলতেন : তোমরা যখন সেজদা কর, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى কত বার বল? যন্ত্রের মতো سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। ইখলাসের সাথে একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى-ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

সুতরাং নির্জন ইবাদতের সময় ঘুম আসে এরূপ চিন্তা করো না। ঘুম এলে ঘুমাও। ইবাদত যতটুকু করবে, সুন্নাত মোতাবেক করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হলো, তেলাওয়াতের সময় ঘুমের চাপ হলে ঘুমিয়ে পড়ো। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে তারপর উঠো এবং তেলাওয়াত করো। কারণ, চোখে ঘুম রেখে তেলাওয়াত করলে মুখ দিয়ে ভুল শব্দও চলে আসতে পারে।

একজন সারা রাত ইবাদত করলো, অন্যজন মাত্র এক ঘন্টা ইবাদত করলো। প্রথমজনের ইবাদত ছিলো সুন্নাত পরিপন্থী। আর দ্বিতীয়জনের ইবাদত ছিলো সুন্নাত অনুযায়ী। তাহলে প্রথম জনের তুলনায় দ্বিতীয়জনই উত্তম।

ইবাদতে বাড়াবাড়ি করো না

আল্লাহ তাআলার দরবারে আমল গণনা করা হবে না। তিনি দেখবেন আমলের ওজন। সুতরাং কী পরিমাণ আমল করলে এটা দেখার বিষয় নয়। দেখার বিষয় হলো কেমন আমল করলে। অযোগ্য আমলে কোনো ফায়দা নেই।

ইবাদত পালনকালে বাড়াবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করো না। যে আমল যেভাবে এসেছে, সেই আমল সেভাবেই পালন করো। যে ইবাদত জামাতের সাথে প্রমাণিত, সেই ইবাদত জামাতের সাথে করো। যেমন ফরয নামাযের জন্য জামাত আছে। রমযানের তারাবীহর নামাযের ক্ষেত্রেও জামাতের বিধান আছে। রমযানের বিতর নামাযেও জামাতের হুকুম আছে। অনুরূপভাবে জানাযার নামাযের জামাতও ওয়াজিব আলাল কিফায়াহ। দু' ঈদের নামাযের জন্যও জামাতের বিধান প্রমাণিত। ইসতিসকা এবং কুসুফের নামায সুন্নাত হলেও জামাতের বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাছাড়া শিআরে ইসলাম হওয়ার কারণে এতদুভয়ে জামাত জায়েয। এই সব নামায ব্যতীত যত নামায আছে, সেগুলোতে জামাত আছে বলে প্রমাণিত নয়। অবশিষ্ট নামাযগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ চান, বান্দা নির্জনে, একান্তে আদায় করুক। এটা বান্দার জন্য বিশেষ মর্যাদা। এ মর্যাদার কদর করা উচিত।

মহিলাদের জামাত

মহিলাদের জামাতের ব্যাপারে মাসআলা হলো, তাদের জন্য জামাত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। ফরয, সুন্নাত এবং নফলসহ সকল নামায তারা একাকি পড়বে। আবারো একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মূলত দ্বীন হলো শরীয়তের অনুসরণ। তাই হৃদয়ে কামনা-বাসনা ছাড়তে হবে। যেভাবে যে ইবাদত করার জন্য বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই সেই ইবাদত করতে হবে। মন তো অনেক কিছু চায়। এজন্য যে তা দ্বীনের অংশ হবে এমন নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা মনের বিপরীত হলেও করতে হবে।

শবে বরাত এবং হালুয়া

শবে বরাত তো আলহামদুলিল্লাহ ফযীলতময় রাত। ইখলাসপূর্ণ ইবাদত যতটুকু সম্ভব ততটুকু করবে। এছাড়া অবশিষ্ট অহেতুক কাজ যেমন হালুয়া-রুটি পাকানো বর্জন করবে। কেননা, হালুয়ার সাথে শবে বরাতের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে শয়তান সবখানেই ভাগ বসাতে চায়। সে চিন্তা করলো, শবে বরাত মুসলমানের গুনাহ মাফ হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, এ রাতে

আল্লাহ তাআলা বনু কালব গোত্রের বকরীর পালসমূহে যত পশম আছে, সেই পরিমাণ গুনাহ মাফ করেন।

শয়তান চিন্তায় পড়ে গেলো, এত মানুষের গুনাহ মাফ হলে যে আমি হেরে যাবো। সুতরাং শবে বরাতে আমিও ভাগ বসাবো। এ চিন্তা করে সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিলো যে, শবে বরাতে হালুয়ার ব্যবস্থা করো।

এমনিতে অন্য কোনো দিন হালুয়া পাকানো নাজায়েয নয়। যার যখন মনে চাবে, হালুয়া পাকাবে, শিন্নি রান্না করবে। কিন্তু শবে বরাতের সাথে হালুয়ার কী সম্পর্ক? কুরআনে এর প্রমাণ নেই। হাদীসে এর অবস্থান নেই। সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাতে এটা পাওয়া যায় না। তাবিঈনদের আমল কিংবা বুযুর্গানে দ্বীনের আমলেও এর নিদর্শন মিলে না। সুতরাং এটা শয়তানের ষড়যন্ত্র। উদ্দেশ্য মানুষকে সে ইবাদত থেকে ছাড়িয়ে এনে হালুয়া-রুটিতে ব্যস্ত রাখবে। বাস্তবেও দেখা যায়, আজকাল ইবাদতের চেয়েও যেন হালুয়া-শিন্নির গুরুত্বই বেশি।

বিদআতের বৈশিষ্ট্য

আজীবন মনে রাখবেন, আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলতেন : বিদআতের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ যখন বিদআতে লিপ্ত হয়, ধীরে ধীরে তখন সুন্নাতের আমল তার কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, শবে বরাতে যারা সালাতুত তাসবীহ গুরুত্বসহ পড়ে, এর জন্য কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাতে দেখা যায় না। আর যে লোকটি বিদআতে অভ্যস্ত। যেমন শিন্নি-রুটি পাকানোর পেছনে থাকে ব্যস্ত, সেই বেশি ফরয নামায সম্পর্কে থাকে নির্লিপ্ত। তার নামায অধিক কাযা হয়। জামাত প্রায়ই ছুটে যায়। এসব অপরিহার্য বিধান ছুটে যায়। আর বিদআত কাজে খুব ব্যস্ততা দেখায়।

শা'বানের পনের তারিখের কাজ

বরাতের রাতের পরের দিন অর্থাৎ শা'বানের পনের তারিখ সম্পর্কেও একটা মাসআলা জেনে রাখা দরকার। তাহলো শা'বানের পনের তারিখের রোযা। পুরা হাদীসের ভাণ্ডারে এ সম্পর্কে শুধু একটি হাদীস পাওয়া যায়। তাও বর্ণনাসূত্র দুর্বল। এজন্য কোনো কোনো আলেম বলেছেন : বিশেষভাবে শা'বানের পনের তারিখের রোযাকে সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব আখ্যা দেয়া জায়েয নয়। হ্যাঁ, শুধু দু'দিন ব্যতীত পুরা শা'বান মাসের রোযার ফযীলত হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। অর্থাৎ– শা'বানের এক তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখার ফযীলত আছে। আর আটাশ ও উনত্রিশ তারিখের রোযা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : রমযানের এক দু'দিন পূর্বে রোযা রেখো না। যাতে রমযানের রোযা পালনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পার।

তবে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো, পনের তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় মাসে আইয়ামে বীযের রোযা রাখতেন। আরবী মাসের তের, চৌদ্দ, পনের তারিখকে আয়ামে বীয বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনগুলোতে প্রায়ই রোযা রাখতেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি শাবানের পনের তারিখে এ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে রোযা রাখতে চায়। অর্থাৎ একটি বিষয় হলো, একটি শা'বান মাসের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টি হলো, এটি আইয়ামে বীযের শামিল। এই দুইটা নিয়তে রোযা রাখলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু এ দিনটিকে শবে বরাতের সাথে সম্পৃক্ত করে বিশেষভাবে রোযা পালন করা কোনো কোনো আলেম নাজায়েয বলেছেন। এজন্যই দেখা যায়, অধিকাংশ ফকীহ যেখানে মুস্তাহাব রোযা আলোচনা করেছেন, সেখানে মহররমের দশ তারিখের রোযা এবং আরাফার দিনের রোযা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা শা'বানের পনের তারিখের রোযাকে ভিন্নভাবে মুস্তাহাব বলেননি। বরং শা'বানের যে কোনো দিনের রোযা উত্তম হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

আমি বারবার বলে আসছি যে, যে কোনো বিষয়কে তার সীমার ভেতরে রাখতে হবে। প্রত্যেক জিনিসকে তার স্তর অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। দ্বীন মূলত এরই নাম। যুক্তির পেছনে চলার নাম দ্বীন নয়। অতএব শা'বানের পনের তারিখের রোযাকেও যেভাবে আছে, সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। তাকে আলাদা সুন্নাত আখ্যায়িত করা যাবে না।

তর্ক-বিতর্ক করবে না

এই হলো শবে বরাত এবং রোযার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ কথাগুলো সামনে রেখে আমল করলে সুফল পাওয়া যাবে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পেছনে পড়বেন না। বর্তমানের সমস্যা হলো, একজন একটা কথা বললে অন্যরা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। অথচ দরকার ছিলো, যার উপর আপনার ভরসা আছে, নির্ভরতা আছে তার কথার উপরই আমল করা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) সুন্দর কথা বলেছেন যে,

اَلْمِرَاءُ يُطْفِئُ نُوْرَ الْعِلْمِ

'এ জাতীয় বিষয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অথবা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে ইলমের নূর চলে যায়।'

আকবর ইলাহাবাদীর কবিতাও এ প্রসঙ্গে বেশ চমৎকার।

তিনি বলেছিলেন–

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں

فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

'মতবাদগত আলোচনা আমি মোটেই করিনি। অহেতুক যুক্তির পেছনে আমি মোটেই পড়িনি।'

মতবাদ নিয়ে অযথা মেতে উঠার মধ্যে সময় নষ্ট হয়। এর মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। যারা ফালতু বুদ্ধি নিয়ে চলে, তারাই এ ধরনের তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাই আমাদের কথা হলো, যে আলেমের কথার উপর আপনার ভরসা আছে, তার কথাই মেনে চলুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে নাজাত দান করবেন। অন্য আলেমের মুখে অন্য কথা শুনে দাপাদাপি করার প্রয়োজন নেই। ব্যস, এটাই সঠিক রাস্তা।

রমযান আসছে, পবিত্র হও

সারকথা হলো, এ রাতের ফযীলতকে ভিত্তিহীন বলা ঠিক নয়। আমার কাছে তো মনে হয়, আল্লাহ তাআলা শবে বরাতকে রেখেছেন রমযানের দু সপ্তাহ পূর্বে। এর মাধ্যমে মূলত রমযানকে স্বাগতম জানানো হচ্ছে। রমযানের রিহার্সেল হচ্ছে। রমযানের জন্য প্রস্তুত করানো হচ্ছে। রমযান মাস আসছে। তৈরি হয়ে যাও। পবিত্র মাস আসছে, যে মাসে আল্লাহর রহমতের বারিধারা আছে। যে মাসে মাগফিরাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। সেই মাসের জন্য প্রস্তুত হও।

মানুষ যখন কোনো বড় দরবারে যায়, তখন যাওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে নেয়। গোসল করে নেয়। কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করে পরিপাটি হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর শাহী দরবার যখন উন্মুক্ত করা হচ্ছে, সেই দরবারে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। অর্থাৎ রমযানের পূর্বে একটি পবিত্র রাত দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আস, আমার কাছে আস। আমি তোমাকে পবিত্রতার সাগরে অবগাহন করিয়ে পবিত্র করে দিই। যেন তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নির্ভেজাল হয়। তোমাকে মাফ করে দিই। পূতঃপবিত্র করে দিই। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা রাতটি দান করেছেন। এ উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমে রমযানকে স্বাগত জানান। রমযানের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লুফে নিন। এর কদর করুন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র এ রাতটিকে মূল্যায়ন করার এবং রাতটিতে ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত